Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৯ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগষ্ট ২০০৬

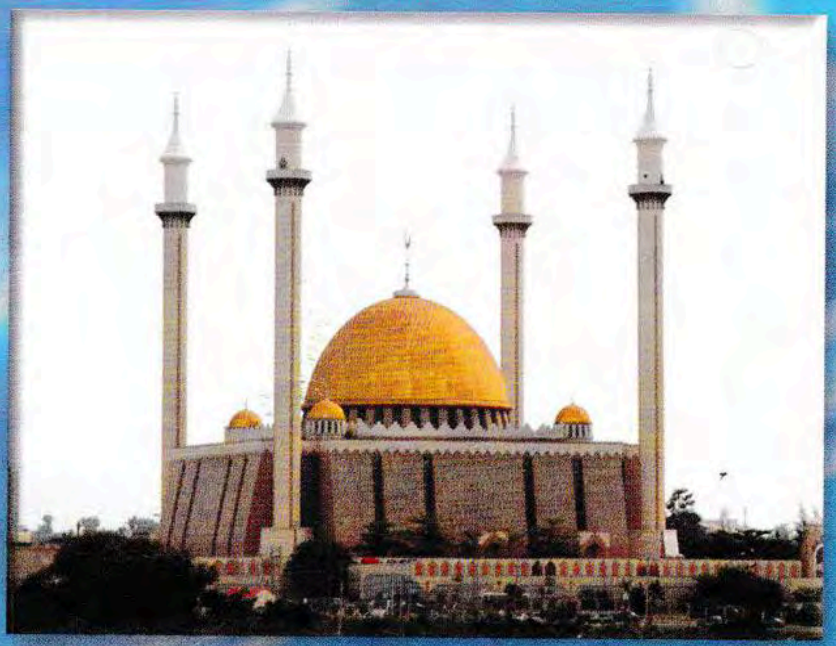

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

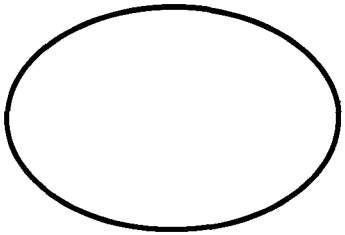

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد : ٩ عدد : ١١ ، رجب و شعبان ١٤٢٧ هـ/اغسطس ٢٠٠٦ م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ আবুজা মসজিদ, নাইজেরিয়া।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. ResearchArticles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741. Mobile: 0175 002380
E-mail: tahreek@librabd.net

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	১১তম সংখ্যা
রজব-শাবান	১৪২৭ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪১৩ বাং
আগষ্ট	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ-১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - যালিম শাসকঃ আল-কুরআনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ ০৩
    - আবু তাহের
  - গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন!! ০৯
    - মুযাফফর বিন মুহসিন
  - শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৬
  - প্রসঙ্গঃ বাউল সাধনা ১৯
    -গোলাম রহমান
  - বাকস্বাধীনতা ও প্রতারণা ২২
    -যহুর বিন ওছমান
  - যেভাবে সমাজে নষ্টামি ছড়ায় ২৪
    -মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- মনীষী চরিতঃ ২৭
  - নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- চিকিৎসা জগতঃ ৩২
  (ক) ঘাতক ব্যাধি হেপাটাইটিস -সি
  (খ) সুস্থ, দীর্ঘ জীবন এবং রংধনু খাদ্য
- ক্ষেত-খামারঃ ৩৪
  (১) মিষ্টি কুমড়ার পুষ্টিগুণ (২) পুকুরে শোল মাছ চাষ
- কবিতাঃ ৩৫
  (১) আত্মবেদনা
  (২) আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন '০৬
  (৩) আজব দেশ আজব রাজা (৪) জবাব চাই
  (৫) অপূর্ব সাথী।
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৭
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- পাঠকের মতামত ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

৯ম বর্ষ ১১ তম সংখ্যা আগষ্ট ২০০৬

লেবাননে ইহুদী দানবঃ খৃষ্টবিশ্বের কপটতা ও মুসলিম বিশ্বের নীরবতা

মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাভূমি স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র লেবাননে চলছে এখন সর্বকালের ভয়াবহ, লোমহর্ষক ও বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞ। ইহুদী বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। জ্বলছে আগুন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে বিভিন্ন নগরী। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পাচ্ছে না এই নৃশংস আক্রমণ থেকে। রেহাই পাচ্ছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাকেন্দ্র এবং হাসপাতালও। ডাক্তাররা প্রাণভয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দেখা দিয়েছে খাদ্য, পানি ও বিদ্যুতের চরম সংকট। সরিয়ে নেয়া হয়েছে বিদেশীদের। পুরো দক্ষিণ লেবানন জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক মারাত্মক ভুতুড়ে পরিবেশ। মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফিলিস্তীনের ন্যায় একই নাটক সাজানো হয়েছে এখানে। দু'জন সৈন্যের তথাকথিত অপহরণের অভিযোগে মধ্যপাচ্যের বিষফোঁড়া বলে পরিচিত জারজ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল গত ১২ জুলাই থেকে লেবাননে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করেছে। পশ্চিমাদের মদদপুষ্ট বিশ্বের চতুর্থ সমরাস্ত্র সরবরাহকারী এই রাষ্ট্রটি অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সামরিক শক্তিতে বহুগুণ দুর্বল লেবাননের উপর হিংস্র হায়েনার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিশাল ট্যাঙ্কবহর নিয়ে এরা লেবাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্বাধীনতাকামী 'হিজবুল্লাহ' নিধনের ছুতোয় গ্রামের পর গ্রাম মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। অসহায় নারী ও শিশুদের বুকফাটা করুণ আর্তনাদ এদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। 'কানা' নামক একটি গ্রামে হামলা চালিয়ে এক রাতেই গ্রামটি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং ৬৪ জন বেসামরিক নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এর মধ্যে ৩৫ জনই হ'ল শিশু। এরকম অসংখ্য গ্রাম ও নগরীকে বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে এরা ধুলার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী এ পর্যন্ত সহস্রাধিক বেসামরিক লোক প্রাণ হারিয়েছে। যার ৪০ শতাংশই শিশু। যারা 'যুদ্ধ' শব্দটির সাথেও পরিচিত না। বোমার স্প্লিন্টারে ক্ষত-বিক্ষত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা শিশুটি জানে না, কেন তার এই করুণ পরিণতি। পিতা-মাতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে যাওয়া শিশুটি এখনো বুঝতে পারেনি যে, তার পিতা-মাতা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছেন। এককথায় লেবাননে বর্তমানে যে মানবিক সংকট চলছে তা বিশ্বের যেকোন বিবেকবান মানুষকে তাড়িত না করে পারে না।

মধ্যপ্রাচ্যের হালচিত্র যখন এরকমই করুণ, তখন খৃষ্টবিশ্বের কপটতাও যেন সর্বোচ্চ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে অবৈধভাবে ইসরাঈল রাষ্ট্র ঘোষণার মাত্র ১২ মিনিটের মাথায় ইসরাঈলকে সমর্থনকারী একমাত্র দেশ আমেরিকা এখন ক্রূর হাসি হাসছে। নির্লজ্জের মত বলছে 'আত্মরক্ষার অধিকার' ইসরাঈলেরও আছে। এটি তো ঐরূপই যেমনটি আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণের পূর্বে বলা হয়েছিল যে, আফগানিস্তান ও ইরাক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। এর চেয়ে হাস্যকর আর কি হ'তে পারে? কোন দুর্বল রাষ্ট্র তার চেয়ে বহুগুণে বেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য হুমকির কারণ হয় কি করে? তাও যদি হয় হাযার হাযার মাইল দূরের কোন রাষ্ট্র? অথচ এই খোঁড়া অজুহাতেই দখল করা হ'ল ইরাক ও আফগানিস্তানের মত দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রকে। এখন চক্রান্ত চলছে ফিলিস্তীন ও লেবানন দখলের এবং প্রতিনিয়ত হুমকি দেওয়া হচ্ছে ইরান ও সিরিয়াকে। মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে লুক্কায়িত বিশাল সম্পদই এদের টার্গেট। গায়ের জোরে এরা মুসলমানদের তেল সহ ভূগর্ভস্থ সকল সম্পদ দখল করতে চায়। সেই সাথে নিশ্চিহ্ন করতে চায় মুসলমানদের এবং পরাতে চায় স্থায়ী গোলামীর জিঞ্জির। ইতিমধ্যে ইরাক দখলের মাধ্যমে যার কিছুটা হ'লেও পূরণ হয়েছে। এখন তেলসমৃদ্ধ বাকী কয়েকটি দেশ দখল করতে পারলেই এদের ষোলআনা আশা পূর্ণ হবে। নচেৎ দু'জন সৈনিকের তথাকথিত অপহরণের অভিযোগে একটি স্বাধীন মুসলিম ভূখণ্ডকে বোমায় বোমায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত? অথচ হাযার হাযার ফিলিস্তীনী ও লেবাননী মুসলমান এদের নিকটেই বন্দী আছে এবং প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশ্বমোড়লদের কেউ 'টু' শব্দটিও করছে না। এ কেমন মানবাধিকার? কেমন বিশ্ববিবেক? মানবাধিকারের পতাকাবাহীদের কোন জবাব আছে কি? বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত 'জাতিসংঘ' নামের প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তাই বা কী? যে জাতিসংঘ মানবতার পক্ষে ও যালেমদের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাবও পাস করতে পারে না, সে 'জাতিসংঘ' খোলস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কী প্রয়োজন? তবে কি জাতিসংঘ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? শক্তিমানদের অন্যায় দলনে যখন প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে অসহায় মা ও শিশু, সে মুহূর্তে জাতিসংঘের এই নিষ্ক্রিয় নীরবতার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই।

অপরদিকে মুসলিম দেশগুলোর একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা 'ওআইসি'-র ভূমিকাও হতবাক করেছে মুসলিম বিশ্বকে। লেবাননে ইসরাঈলী আগ্রাসনের ২২ দিনের মাথায় গত ৩ আগষ্ট'০৬ মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ৫৭ সদস্য বিশিষ্ট এই সংস্থার যরূরী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'লেও নিন্দাপ্রস্তাব ও যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানানো ব্যতীত কার্যত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উপস্থিতির সংখ্যাও ছিল একেবারে হতাশাজনক। তবে কি এটি জবাবদিহিতার জন্য দায়সারা সম্মেলন ছিল? লেবাননে যখন মানবিক সংকট চলছে, প্রতিনিয়ত নিহত হচ্ছে শত শত নিরীহ মুসলিম, তখন এধরনের সাইনবোর্ড সর্বস্ব সম্মেলনের যৌক্তিকতা কতটুকু? যেখানে শক্তির প্রয়োজন, প্রয়োজন দৃঢ় কণ্ঠে কথা বলার সেখানে কি মিষ্টিবাক্য ব্যয়ে কোন ফায়দা হবে? অনুরূপভাবে আরবদেশ সমূহের সংগঠন 'আরবলীগের' ভূমিকাও হতাশাজনক। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই যে, মুসলিম বিশ্বের নীরবতার সুযোগেই খৃষ্টান জগত বেপরোয়া হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হ'লে এবং সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করলে এরা পালিয়ে বাঁচারও সুযোগ পাবে না। ভিয়েতনামের ভাগ্যবরণ ছাড়া এদের আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানদের মধ্যে আজ একতা নেই। পারস্পরিক বিষোদগারেই মুসলমানরা অধিক ব্যস্ত। অপরদিকে কুফুরী শক্তি সব এক। ইহুদী-খৃষ্টানরা যেখানে ছিল চির সংঘাতময়, যে খৃষ্টানরা ইহুদীদেরকে পৃথিবী থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছিল, হিটলার যেখানে একচেটিয়া ইহুদীদেরকে হত্যা করেছিল সেই চির বৈরী দু'টি জাতি এখন মুসলিম নিধন ইস্যুতে এক। এরপরও কি মুসলিম নেতাদের হুঁশ ফিরবে না?

জানা আবশ্যক যে, মুসলমানদের সাথে ইহুদী-খৃষ্টানদের ইতিহাস চির কপটতারই ইতিহাস। মদীনার বনু নাযীর গোত্রের শালিশী বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রাচীরের পাদদেশে বসতে দিয়ে প্রাচীরের উপর থেকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল এই ইহুদীরাই। খায়বরের ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাওয়াত করে খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। এদেরই দোসর মুনাফিক লাবীদ বিন আ'ছাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুলে যাদু করে তাঁকে চিরতরে মস্তিষ্কবিকৃত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধে এরাই কাফেরদেরকে সাহায্য করেছিল। ১০৯৮-১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধে অবশেষে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে গোটা ইউরোপীয় খ্রীষ্টান শক্তির পরাজয়ের ফলে এরা আরো বেশী প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল ইউরোপের স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় নযীরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে ৭ লক্ষ নিরস্ত্র মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে শহরের মসজিদ সমূহে তালাবদ্ধ করে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল নরপশু খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও পার্শ্ববর্তী পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা। পরবর্তীতে ১ম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যখন যেরুযালেম মুসলমানদের হাত থেকে বৃটিশ খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়, সেদিন যেরুযালেমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বৃটিশ জেনারেল এলেনবাই বলেছিল Today ends the crusade 'আজকে ক্রুসেড শেষ হ'ল'। ১৯২০ সালে ফরাসী জেনারেল গুরিয়ান একইভাবে সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কবরে পা রেখে বলেছিল, We have come back Saladin 'ছালাহুদ্দীন আমরা আবার ফিরে এসেছি'। সেই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত আছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এরা আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। মুসলিম অধ্যুষিত জনপদগুলিকে এরা সংঘাতময় করে তুলছে এবং ক্রমান্বয়ে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অপরদিকে ইহুদী-খৃষ্টান অধ্যুষিত ভূখণ্ড হ'লেই তার স্বাধীনতার পথ দ্রুত অবমুক্ত করে ছাড়ছে।

অতএব হে মুসলিম বিশ্বের শাসকবৃন্দ! একের পর ভূখণ্ড হাত ছাড়া হওয়ার পরও কি আমাদের সম্বিত ফিরে আসবে না? আর কতদিন নিজেরা স্বার্থদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকব? কতদিন অন্যের গোলামী করে চলব? একটিবার তাকিয়ে দেখুন ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন ও লেবাননসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত লাশের দিকে। চেয়ে দেখুন নিজ ভূমে কিভাবে তারা স্বাধীনতা হারিয়ে শরণার্থী হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আবু গারীব ও গুয়ান্তানামো-বে বন্দীশিবিরে কিভাবে চলছে মুসলিম বন্দী নির্যাতন। আমাদের তেলের অর্থে কেনা অস্ত্র দিয়ে আমাদেরই বুক ঝাঁঝরা করা হচ্ছে। অথচ আমরা ভ্রুক্ষেপই করছি না। আমাদেরকে যেকোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবতীয় অন্যায় ও যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে। কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে ওআইসিকে। মুসলিম বিশ্বের জন্য জাতিসংঘ নয় ওআইসিই হ'তে পারে ত্রাণকর্তা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

যালিম শাসকঃ আল-কুরআনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

*আবু তাহের**

প্রাককথাঃ

যালিম শাসক অর্থ অত্যাচারী শাসক। যালিম শাসক সর্বদা নির্দয়, নিষ্ঠুর ও উৎপীড়ক হয়ে থাকে। ন্যায়পরায়ণতার চিহ্ন থাকে না তার শাসনে এবং নীতি ও আচরণে। তার নীতি হচ্ছে খেয়ালখুশি মত জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং মানুষের মান-সম্মান পদদলিত করা। যালিম শাসক হয় ভয়ংকর স্বার্থপর এবং পাশবিক প্রবৃত্তির অনুসারী। যুলুম, শোষণ, ধোকা, প্রতারণা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হয় তার আদর্শ। তার অত্যাচারের ভয়ে জনগণ সবসময় আতংকগ্রস্ত থাকে। যালিমের দুঃশাসন থেকে নিষ্কৃতির জন্য মাযলূম মানবতা সর্বদা আহাজারী করতে থাকে। দুঃশাসনের কারণে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা চরমভাবে ভেঙ্গে পড়ে। প্রতিনিয়ত সর্বক্ষেত্রে নিগৃহীত হ'তে থাকে জনগণ। যালিম শাসকের মনোরঞ্জন এবং ইচ্ছার কাছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিতে হয়। বিগত যুগের বহু যালিম শাসকের স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল-কুরআনের আলোকে যালিম শাসকের স্বরূপ বিশ্লেষণই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

রুবুবিয়াত প্রতিষ্ঠা করাঃ

'রুবুবিয়াত' শব্দটি 'রব' শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার হুবহু অর্থ প্রকাশক কোন শব্দ বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় না। তবে সার্বভৌম শব্দকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং রুবুবিয়াত প্রতিষ্ঠা করা অর্থ হ'ল নিরংকুশ ও একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র অধিকার। কিন্তু যুগে যুগে যালিম শাসকরা মহান আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বে নিজেদেরকে অংশীদার করার চেষ্টা করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَآجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ آتَهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِيْ وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'তুমি কি সেই লোককে দেখনি, যে রব-এর ব্যাপারে ইবরাহীমের সাথে বাদানুবাদ করেছিল এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার রব তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত করেন, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন ঐ কাফির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২৫৮)*। উল্লেখ্য যে, 'রুবুবিয়াত' শব্দটি কুরআনে বিভিন্ন রূপে ৯৭৬ বার উল্লিখিত হয়েছে।[১]

অহি-র দাওয়াত বন্ধ করাঃ

অহি-র দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা, প্রচারে বাধা ও প্রচারকদেরকে নির্যাতন করার কারণে আল্লাহ বহু যালিম শাসক ও গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন। নূহ (আঃ)-এর অত্যাচারী জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রলংকরী মহাপ্লাবন দ্বারা *(যারিয়াত ৪৬; শু'আরা ১০২)*। আল্লাহদ্রোহী আদ জাতির উপর আরোপিত হয়েছিল পাথরের ঝড়, অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ *(নাজম ৫০; যারিয়াত ৪১-৪৬; আহকাফ ২৫; মুমিন ৪১)*। অহংকারী ছামূদ জাতির উপরে আপতিত হয়েছিল প্রবল বায়ু, ঝড়, বৃষ্টি, সঙ্গে কানফাটা বজ্র নিণাদ আর বিদ্যুতের ঝলকানি এবং সংঘটিত হয়েছিল ভূমিকম্প, কংকর বর্ষিত হয়েছিল প্রবল বায়ুর সঙ্গে *(শু'আরা ১৪১-১৫১)*। যালিম শাসক ফের'আউন ও তার দলবল ধ্বংস হয়েছিল লোহিত সাগরে চতুর্দিক থেকে প্রবল বেগে ছুটে আসা পানির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে *(যারিয়াত ৪০; যুখরুফ ৫৫; ক্বাছাছ ৪০; ত্ব-হা ৭৮; আ'রাফ ১৫৫)*। বিপুল অর্থ-সম্পদ আর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী অহংকারী কারূণ ধ্বংস হয়েছিল প্রচণ্ড ভূমিকম্পে *(ক্বাসাস ৮১; নূর ৪৩)*। অত্যাচারী সাবা জাতি ধ্বংস হয়েছিল বাঁধভাঙ্গা প্রবল বেগে ছুটে আসা পানির চাপে *(দুখান ৩৭; সাবা ১৬)*। অথচ আবহমান কাল থেকেই যালিম শাসক অহি-র দাওয়াত বন্ধ করে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালিয়ে আসছে। আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَانُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ-

'তারা বলল, হে নূহ! যদি তুমি (অহি-র দাওয়াত) থেকে বিরত না হও, তবে নিশ্চয়ই তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে' *(শু'আরা ১১৬)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ-

'তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কার করা হবে' *(শু'আরা ১৬৭)*।

* বি.এ (অনার্স), এম. এ (হাদীছ); কুন্দপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

১. *মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাক্বী, আল-মু'জামুল মুফাহ্‌রাসু লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ৩৫০-৩৬৭।*

অহি-র প্রচারকদের প্রতি নির্যাতনঃ

সর্বযুগে সকল যালিম শাসকই অহি-র ধারক-বাহক ও প্রচারকদের উপরে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। নির্যাতনে পিষ্ট হয়ে অসংখ্য নবী, রাসূল ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হাসিমুখে শাহাদত বরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ-

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন' *(আলে ইমরান ২১)*।

অহি-র প্রচারকদের প্রতি যালিম শাসকের লোমহর্ষক নির্যাতনের বর্ণনা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে পরিষ্কার জানা যায়,

قَالَ عَبْدُ اللهِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَوْمُهُ فَاوْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمُ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'আব্দুল্লাহ বলেন, আমি যেন এখনো নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন এভাবে যে, তাঁর জাতির লোকেরা তাকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তার চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা অজ্ঞ'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়েও আরবের যালিম গোষ্ঠী কর্তৃক ছাহাবীগণ নির্যাতিত হ'তেন। এ সময় মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বিভিন্নভাবে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতেন।

খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ) বলেন,

شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُوْ اللهَ لَنَا، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَايَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ-

'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে (কাফিরদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিলাম এসবের) অভিযোগ করছিলাম। তখন কা'বা শরীফের ছায়ায় তিনি চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের (দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের) জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন না? তিনি বললেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের (ঈমানদার) অবস্থা ছিল এই যে, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হ'ত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দ্বারা মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হ'ত। এসব কিছুই তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়িয়ে শরীরের হাঁড় থেকে মাংস ও শিরা-উপশিরা সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এত কিছুর পরও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি'।[৩]

যালিমদের অত্যাচারের হাত থেকে মহানবী (ছাঃ) পর্যন্তও রেহাই পাননি। হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ ظَهْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَءُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ نِ خَلَفٍ أَوْ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ- شُعْبَةُ الشَّاكُ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيٍّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ- فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ-

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন 'একদা নবী করীম (ছাঃ) সিজদা করলেন। তাঁর আশপাশে কুরাইশের কয়েকজন লোক বসেছিল। এমন সময় উক্বা ইবন আবু মুঈত (যবাইকৃত) উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর পিঠের উপরে নিক্ষেপ করল। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না। (সংবাদ পেয়ে) ফাতিমা (রাঃ) এসে তাঁর পিঠের উপর থেকে এগুলি সরিয়ে দিলেন এবং যে এ কাজ করেছে তার জন্য বদদো'আ করলেন। এরপর নবী করীম (ছাঃ) (মাথা উঠিয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ! পাকড়াও কর কুরাইশ নেতাদেরকে আবু জাহল ইবনু হিশাম, উৎবা ইবনু রাবিয়া, শায়বা ইবনু রাবিয়া, উমাইয়া ইবনু খালফ অথবা উবাই ইবন খালফ। (রাবী এপি শোবার সন্দেহ)। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত অবস্থায় দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত এদের সবাইকে সেদিন একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার গ্রন্থিগুলি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল যে, তাকে কূপে নিক্ষেপ করা যায়নি।[৪]

---

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩১৩ 'কিতাবুর রিক্বাক্ব'।*

৩. *বুখারী, হা/৩৬১২, 'মানাকিব বা মর্যাদা' অধ্যায়; ফৎহুলবারী, হা/৩৬১২।*

৪. *বুখারী, হা/৩৮৫৪ 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়; ফৎহুলবারী, হা/৩৮৫৪।*

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِيْ بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ شَدِيْدًا- فَأَقْبَلَ أَبُوْبَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ-

উরওয়া বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার মুশরিক কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা কঠোর আচরণের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) কা'বা শরীফের (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর নামক স্থানে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন উকবা বিন আবু মুঈত্ব আসল এবং তার চাদর দিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কণ্ঠনালী চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলল। তখন আবু বকর (রাঃ) এগিয়ে এসে উকবাকে তার কাঁধে ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, আল্লাহই আমার রব'।[৫]

শিরক লালন করাঃ

যালিম শাসকের অন্যতম স্বভাব হ'ল রাষ্ট্রীয়ভাবে শিরক লালন করা। আর শিরক হ'ল সবচেয়ে বড় যুলুম। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لاَتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

'(স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলল, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় যুলুম' *(লোক্বমান ১৩)*।

উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দীর্ঘ এক হাযার বছর পৃথিবীতে শিরক ছিল না। নূহ (আঃ)-এর সময় থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিরক শুরু হয়।[৬] তারপর থেকে অদ্যাবধি যালিম শাসকরা শিরক লালন করে চলেছে। আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَسُوَاعًا وَّلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا-

'তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নসরকে' *(নূহ ২৩)*।

৫. *বুখারী, হা/৩৮৫৬; ফৎহুলবারী, হা/৩৮৫৬।*
৬. *ড. ছালিহ ফাওযান আল-ফাওযান, কিতাবুত তাওহীদ (কুয়েত, আর,আই,এইচ, এস) পৃঃ ৪।*

অপরাধ কর্ম সম্পাদন করাঃ

অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ করা হ'ল সরকারের অন্যতম কাজ। কিন্তু যালিম শাসকের দ্বারাই অপরাধ সংঘটিত হয়। ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন যালিম শাসকই স্বীয় রাষ্ট্র থেকে অপরাধ দমনে সক্ষম ও সফল হয়নি। কারণ বড় বড় অপরাধ তাদের দ্বারা ও তাদের ছত্রছায়ায় সংঘটিত হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسَى وَهَارُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ-

'অতঃপর আমরা তাদের পরে মূসা ও হারূণকে আমাদের আয়াত সমূহ সহকারে ফিরাঊন ও তার দলীয় সরদারদের নিকটে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ প্রকাশ করল। আসলে তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়' *(ইউনুস ৭৫)*।

সীমালংঘন করাঃ

যালিম শাসক সীমালংঘনকারী ও অহংকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ-

'ফেরাঊন ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়' *(দুখান ৩১)*।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوْسَى وَأَخَاهُ هَارُوْنَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ-

'অতঃপর আমরা মূসা ও তাঁর ভাই হারূণকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট দলীল সহকারে ফিরাঊন ও তার দলবলের নিকটে পাঠিয়েছিলাম। তখন তারা অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করল। আর আসলে তারা নিজেদেরকে সর্বোচ্চস্থানীয় মনে করত' *(মুমিনুন ৪৫-৪৬)*।

আর আল্লাহ এই যালিমদেরকে পাপাচারী হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন *(ক্বাছাছ ৩২)*।

ঢালাওভাবে জনগণকে গ্রেফতার করাঃ

যালিম শাসকের আরেকটি স্বভাব হ'ল ভিন্ন মতাবলম্বী ও হকপন্থীদের ঢালাওভাবে মিথ্যা অজুহাতে গ্রেফতার করে ত্রাসের রাজ্যত্ব কায়েম করা। আল্লাহ বলেন,

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ-

'ফেরআঊন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তাহ'লে আমি তোমাকে (গ্রেফতার করে) অবশ্যই কারারুদ্ধ করব' *(শু'আরা ২৯)*।

বিচার বিভাগ দলীয়করণ করাঃ

যালিম শাসকের নিকটে আইনের বাধ্যবাধকতা নেই। মাযলূমের আর্তনাদ তাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। স্বীয় স্বার্থে পরিচালিত হয় আইন ও বিচার বিভাগ। আল্লাহ বলেন,

إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ- وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ-

'যদি তাঁর (ইউসুফ (আঃ)-এর) জামা সামনের দিকে ছিঁড়া থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদী এবং সে মিথ্যাবাদী। আর যদি তাঁর জামা পিছনের দিকে ছিঁড়া থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদী এবং তিনি সত্যবাদী' *(ইউসুফ ২৬-২৭)*। ঘটনাক্রমে সত্য যখন প্রকাশিত হ'ল যালিম অর্থমন্ত্রী ইতফীর ক্ষমতার দাপটে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হ'ল এখন নিরপরাধ নবী ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হ'ল। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا رَآ قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ-

'অতঃপর তার স্বামী যখন দেখল যে, তাঁর জামা পেছনের দিকে ছিঁড়া, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের ষড়যন্ত্র। নিঃসন্দেহে তোমাদের ষড়যন্ত্র খুবই মারাত্মক' *(ইউসুফ ২৮)*।

সন্ত্রাস সৃষ্টি করাঃ

যালিম শাসকের বিশেষ স্বভাব হ'ল রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা। স্বীয় স্বার্থ হাছিলের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ, দল ও ক্যাডার তৈরী করতঃ প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা ও ধ্বংস করা। এদের কু-স্বভাব উল্লেখ পূর্বক আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ-

'ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল ফাসাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী *(ক্বাছাছ ৪)*। আর এদের সন্ত্রাসের ধরনও বহুমুখী।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সংঘটিত প্রায় সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আল-কুরআনে বর্ণিত সন্ত্রাসী কার্যাবলীর আধুনিকীকরণ মাত্র। গভীর রজনীতে ছদ্মবেশে জনবসতিতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা ও সকাল বেলা মহৎ নেতা সেজে জনপ্রিয়তা লাভের জন্য শাসকী তহবিল থেকে দু'চার টাকা খয়রাতী করার প্রবাদ যালিম শাসকের জন্যই প্রযোজ্য।

হক্বপন্থীদের প্রতি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দোষ চাপিয়ে দেওয়াঃ

অতীত ও বর্তমান ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যালিম শাসকের স্বভাব হ'ল হক্বপন্থীদের প্রতি সন্ত্রাসী অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ-

'ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দিবে মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে। দেশময় ফাসাদ, সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করার জন্য। সে বলল, আমি অচিরেই হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদেরকে, আর জীবিত রাখব তাদের মেয়েদেরকে। বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল' *(আ'রাফ ১২৭)*। মূলতঃ সে সময়ে ফেরাউনই ছিল পৃথিবীর সেরা সন্ত্রাসী। সে নিরপরাধ স্বল্পসংখ্যক বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীবাণী উচ্চারণ করেছিল নিম্নভাবে,

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ- لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ-

'ফেরাউন বলল, তোমরা কি (তাহ'লে) আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে? এটা যে প্রতারণা, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদেরকে শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা অচিরেই বুঝতে পারবে। অবশ্যই আমি কেটে দিব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়িয়ে মারব' *(আ'রাফ ১২৩-১২৪)*। সন্ত্রাসী ফেরাউনের জবাবে হক্বপন্থীগণ বলেছিলেন,

قَالُوْا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ- وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ-

'তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর আমাদের রবের নিকটে ফিরে যেতেই হবে। বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শন সমূহের প্রতি যখন যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের রব! আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান কর' *(আ'রাফ ১২৬)*।

জনগণের ধন-সম্পদ লুট করাঃ

যালিম শাসকের জনগণের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়ে বিশাল বিশাল প্রাসাদ গড়ে থাকে। দুর্বল, অক্ষম, ইয়াতীম-মিসকীনদের সম্পদ পর্যন্ত এদের নিকটে নিরাপদ নয়। দরিদ্র জনগণের জীবিকা নির্বাহের উপায় সমূহ করায়ত্ত করে তাদেরকে কষ্ট করে উপার্জন করার উপকরণ থেকে ও

বঞ্চিত করে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দিয়ে মারাই যালিম শাসকের স্বভাব। এইরূপ শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা খিজির ও মূসা (আঃ)-এর জ্ঞানান্বেষণমূলক সফরের বিবরণীতে বলেন,

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا-

'নৌকাটির ব্যাপার, সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে কাজ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। কেননা তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশা। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত' *(কাহফ ৭৯)*।

সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে অপমানিত করাঃ

যালিম শাসকের অন্যতম স্বভাব হ'ল দেশের সম্মানিত ব্যক্তিগণকে অপমানিত করা। এদের নিকটে কে সম্মানিত, কে অসম্মানী, কে সর্বজন স্বীকৃত সমাজ সংস্কারক, আর কে সর্বমহলে পরিচিত সন্ত্রাসী এসবের কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ-

'নিশ্চয়ই রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনবসতির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে তখন তারা সেই জনবসতিকে ধ্বংস করে এবং তার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বানায় সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তাদের এইরূপ কাজ চিরন্তন' *(নামল ৩৪)*।

উপরোক্ত আয়াতটি মানব জীবনের কার্যকর ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম কখনই দেখা যায়নি। বর্তমানেও নেই। ভবিষ্যতেও ব্যতিক্রম দেখা যাবে না। সাইয়্যিদ কুতুব (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন, এরা যে দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দেশেই ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। সেদেশের মানমর্যাদা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে। প্রতিরক্ষা শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। সেখানকার সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। কেননা এরাই হয়ে থাকে সেদেশের পরাশক্তি। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের স্থায়ী চরিত্র। এর ব্যতিক্রম কখনই হয় না।[৭]

ধার্মিক সাজাঃ

যালিম শাসক যখন দেখে জনগণের মধ্যে ধর্মের ভাবধারা অত্যন্ত প্রবল, ধর্মের কথা বললে মানুষ সহজেই অনুপ্রাণিত হয় তখন সে জনগণের সম্মুখে নিজেকে বড় ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও সত্য পথপ্রদর্শক রূপে পেশ করে। এদের মাথায় টুপি ও গায়ে হিজাব পরতে তখন সময় লাগে না। এসব প্রতারণামূলক রাজনীতির প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِى الْأَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ اِنْ جَاءَنَا ط قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمْ اِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ اِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ-

'হে আমার কওম! আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ, কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি তো তোমাদেরকে তাই বলি, যা আমি সর্বোত্তম মনে করি। আর আমি নির্ভুল ও সত্য পথেরই সন্ধান দেই' *(মুমিন ২৯)*।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত স্বভাবগুলি যে শাসক বা সরকারের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সেই শাসক নিঃসন্দেহে যালিম শাসক। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দল তাদের সমালোচনা করতে সাহস করুক বা না করুক, তারা আল্লাহ্‌র জবাবদিহীর সম্মুখীন হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَالْإِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

'রাষ্ট্রপতি যিনি জনগণের প্রতিনিধি তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'।[৮] অন্যত্র বলেন,

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ-

'তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিঃস্ব যার কোন দিরহাম ও সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের ময়দানে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও ছওয়াব সহকারে উপস্থিত হবে। তার সাথে ঐ সকল ব্যক্তিরাও তখন উপস্থিত হবে যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো উপরে

৭. *সায়্যিদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ১৪৬।*

৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫, পৃঃ ৩২০।*

রক্তপাত করেছে এবং কাউকে অন্যায় ভাবে প্রহার করেছে। অতঃপর তার এই ছওয়াব হ'তেই ঐসব লোককে যুলুমের পরিমাণ মত ছওয়াব প্রদান করা হবে। যদি তাদের ঋণ পরিশোধের পূর্বেই যালিমের ছওয়াব শেষ হয়ে যায় তাহ'লে মাযলূমের পাপ ঐ যালিমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৯]

যালিম শাসকের গঠনমূলক সমালোচনা করা মাযলূম জনতার ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন,

لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا-

'আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পসন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি যুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী ও বিজ্ঞ' *(নিসা ১৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْمَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ أَيَّاهُ-

'তোমার ভাইকে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক সাহায্য কর। এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করব। কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখ। এটাই অত্যাচারীর প্রতি তোমার সাহায্য'।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅতের পূর্বে যালিম গোষ্ঠীর অত্যাচার থেকে জনগণকে সাহায্য করার জন্য 'হিলফুল ফযূল' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১১]

অতএব, আজ কি কেউ আছে যে যালিম শাসকের যুলুম বন্ধ করবে? নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মাযলূমের পাশে এসে দাঁড়াবে? নির্যাতিতের পরিবারের আকাশভারী কান্নার দ্বার রুদ্ধ করবে? কে আছে এমন, যে বুভুক্ষু অত্যাচারিতের মুখে আহার্য তুলে দিবে। আল্লাহ যালিমকে প্রতিহত করুন এবং মযলূমকে করুন পুরস্কৃত- আমীন!

৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৪৯৫৮, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।*
১১. *ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতূম (ভারতঃ আর, আই, এইচ, এস, ২০০৩ইং) পৃঃ ১২০।*

সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কোর্স

মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন তার অন্যতম প্রকল্প 'সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স'-এ অংশগ্রহণের জন্য কওমী মাদরাসা শিক্ষিত আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করছে। প্রশিক্ষণ শেষে বাছাইকৃতদের জন্য সংবাদপত্রে চাকরির ব্যবস্থা করা হতে পারে।

নিয়মাবলী ঃ

১। দরখাস্তের সাথে এক কপি রঙিন ছবিসহ সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত (নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্মতারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, ফোন নম্বর ও থাকলে ই-মেইল অ্যাড্রেস) সংযুক্ত করতে হবে।
২। বয়স ১৫ অগাস্ট ২০০৬ ঈসায়ী তারিখে সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে।
৩। বাংলা ভাষায় লেখালেখির পূর্বঅভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪। ইংরেজি ভাষা পড়তে ও লিখতে পারা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৫। প্রশিক্ষণের জন্য এক সপ্তাহ সার্বক্ষণিক সময় প্রদানে প্রস্তুত থাকবে হবে।
৬। প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোন ফি প্রদান করতে হবে না।

ফ্রি সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী কওমী মাদরাসা শিক্ষিতদেরকে সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত *'মহাপরিচালক, মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন, বাড়ি # ৩০, রোড # ১৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০'*-এই ঠিকানায় আগামী ১৫ অগাস্ট ২০০৬ ঈসায়ী তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

– মহাপরিচালক

মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন

বাড়ি # ৩০, রোড # ১৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, ফোন # ৮৯১১৪২৪

গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন!!

*-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**
মুযাফফর বিন মুহসিন

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদেরকেই কেবল **'আহলেহাদীছ'** বলা হয়। আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত বিধানের প্রকৃত ধারক ও বাহক হিসাবে এবং বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিরঙ্কুষ অনুসারী ও ছাহাবায়ে কেরামের যথাযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইতিহাসে এক আপোসহীন আন্দোলনী কাফেলা বলে সুপরিচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিরন্তন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই আন্দোলনী ধারা চির সত্যের উপর আজ অবধি পরিচালিত হয়ে আসছে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ সত্যের উপরই পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ।[১] তবে এর গতি কখনো হবে দুর্বার, কখনো হবে মন্থর, যা যুগ পরম্পরায় ঘটে আসছে। তাই **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'** যখনই যেখানে বেগবান হয়েছে তখনই সেখানে অগ্নি পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। ইতিপূর্বে যেমন স্বার্থদুষ্ট চরিত্রহীন বিদ'আতী আলেমরা এবং কথিত ইসলামের ধ্বজাধারীরা তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে সমাজনেতা, শাসকগোষ্ঠী এবং বিধর্মীদের সাথে আঁতাত করে এই আন্দোলনের অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, ঠিক তেমনি আজও ঐ একই প্রকৃতির মানব কীটরা একই নিয়মে আহলেহাদীছদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। প্রতি যুগেই ভ্রান্ত দলগুলো এভাবেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তবে শত যুলুম-নির্যাতন, ষড়যন্ত্র চালিয়েও তারা এ আন্দোলনকে কখনো উৎখাত করতে পারেনি। বরং শত্রুরাই অসহনীয় মরণজ্বালা নিয়ে অতৃপ্ত হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপমহাদেশে ইসলামের নামে সৃষ্ট একটি মতবাদের ব্যাজধারীগণ আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুচতুরভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে। হাদীছের বিরুদ্ধে সন্দেহবাদ আরোপকারী এই পাশ্চাত্য ধারার নতুন দলটির বিরুদ্ধে উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামও তীব্র লেখনী পরিচালনা করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাদেশ অঞ্চলে ঐ ভ্রান্ত দলের কার্যক্রম শুরু হলে অন্যান্য আলেমগণের ন্যায় মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) স্বীয় মাসিক পত্রিকায় 'একটি পত্রের জওয়াব' শিরোনামে এদের মুখোশ খুলে দেন। কিন্তু এদের ধোঁকায় পড়ে অনেক আহলেহাদীছ সন্তান উক্ত দলে ঢুকে পড়ে। অন্যদিকে মাওলানা কাফী (রহঃ)-এর মৃত্যুর পরে অলস নেতৃত্বের কারণে 'আন্দোলন' ঝিমিয়ে পড়ে। এভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, আহলেহাদীছ মেধাগুলোকে কুচক্রীরা যখন তাদের কর্মচারীর মত ব্যবহার করছিল, এয়ানতের নামে তাদের অর্থ-সম্পদ, ওশর-যাকাত, ফিৎরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; যখন আহলেহাদীছ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, সাংগঠনিক তৎপরতা এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিলুপ্ত হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুমন্ত আহলেহাদীছ সমাজকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এবং দিকভ্রান্ত সন্তানদেরকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী, তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজকে নিয়ে গঠন করেন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**। অতঃপর একই লক্ষ্যে পরের বছর ১৯৭৯ সালে তিনি লিখলেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?'** নামক এক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা। তাঁর এই সাড়া জাগানো লেখনী প্রকাশিত হওয়ার পর আহলেহাদীছ আন্দোলনের পুনর্জীবনী ধারা পুনরায় শুরু হ'ল। শুরু হলো দেশব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রম। সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণরা দলে দলে ফিরে আসতে থাকে নিজস্ব মোহনায়। ফলে চিরন্তন ধারা অনুযায়ী শুরু হয় ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্রের বিস্তার।

তারা বুঝতে পেরেছিল নির্ভেজাল তাওহীদী চেতনার আহলেহাদীছ প্রতিভাগুলো নিষ্ক্রিয় না করা গেলে তাদের মতবাদ অচল যে হয়ে পড়বে। সেকারণ এর মূলোৎপাটন যে অবশ্যম্ভাবী তা তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করছিল। যেমন সাক্ষাৎ ধ্বংসে পতিত হয়েছে উক্ত মতবাদের জন্মস্থান পাকিস্তানে। আহলেহাদীছ সংগঠনের বিরুদ্ধে তাদের ওঠে পড়ে লাগার অন্যতম কারণ হ'ল- দেশে অন্যান্য আরো ইসলামী দল থাকলেও সেগুলো প্রায় সবই ভিন্ন ভিন্ন আক্বীদা ও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছরা হ'ল সমগ্র দেশব্যাপী সামাজিক ভিত্তি সম্পন্ন একই আক্বীদা ও আমলে বিশ্বাসী বিশাল জনশক্তি। তারা জেগে উঠলে সামাজিক অস্তিত্বহীন ঐ বিভ্রান্তদের পরিণতি যে নিশ্চিত ভয়াবহ হবে তা তারা সর্বদা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। তাই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর হ'তে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে ৫ ও ৬ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী স্মরণীয় সেমিনার ও জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রথমেই তারা আহলেহাদীছের ঐ আদি সংগঠনের চেতনাহীন নেতাকর্মীদেরকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে আহলেহাদীছ হওয়া সত্ত্বেও আহলেহাদীছদের সক্রিয় সংগঠন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উপর তারা চালাতে থাকে যুলুম ও নির্যাতন। গীবত, তোহমত ও মিথ্যাচারের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয় উক্ত সংগঠন ও তার নেতৃবৃন্দের উপর। কিন্তু ডঃ মুহাম্মাদ

* সিনিয়র প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, খুলনা।
১. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়; আলোচনা দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০।

আসাদুল্লাহ আল-গালিব গভীর ধৈর্যের সাথে সকল ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের দুর্দমনীয় কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন।

অতঃপর ১৯৮৬ সালের ২২ অক্টোবর তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সম্মেলনে ছাত্র ও যুব সমাজ, ওলামায়ে কেরাম, উপদেষ্টা এবং সুধীবৃন্দের নিকট তিনি পেশ করেন **'সমাজ বিপ্লবের ধারা'** এবং **'তিনটি মতবাদ'** শিরোনামে দু'টি অতি মূল্যবান ভাষণ। এ ভাষণই পরের বছর বই আকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য তিনটি মতবাদ ছিল 'তাক্বলীদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ও 'রাজনীতিই ধর্ম' বিষয়ে। এরপর থেকে দিকভ্রান্ত আহলেহাদীছ সন্তানদের মধ্যে সঠিক চেতনা ফিরে আসে, তরুণরা অন্যের গোলামীর জিঞ্জির মুক্ত হয়ে বাঁধভাঙ্গা গতিতে নিজেদের প্লাটফরমে সমেবত হ'তে থাকে। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সৃজনশীল প্রজ্ঞা, ক্ষুরধার লেখনী এবং আপোসহীন বাগ্মীতায় যুব সমাজ হয়ে উঠতে থাকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত।

শত্রুরা এই অগ্রগতিকে বরদাশ্ত করতে পারল না। সূক্ষ্ম দুরভিসন্ধি এঁটে সংগঠনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালায়। তারই অংশ হিসাবে সংগঠনে ঢুকে পড়ে এক কুচক্রী। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন সাবার ন্যায় গাইবান্ধার ঐ ক্রীড়নক সংগঠনকে ভাইরাসে আক্রান্ত করে তোলে। একই সময়ে ঐ আহলেহাদীছ সংগঠনের বৈরীভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে সে সময়ের আরেক উদীয়মান প্রতিভা আবদুল মতীন সালাফীকে মিথ্যা অভিযোগে ১৯৮৯ সালের ২রা জুলাই মাত্র তিন ঘণ্টার নোটিশে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। যিনি নিরলসভাবে আহলেহাদীছ সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছিলেন, যার কথা বাংলার আহলেহাদীছ দরদীরা আজও ভুলতে পারে না। এই অনন্য প্রতিভা চাপা দুঃখ-ক্ষোভ নিয়ে নিজ দেশ ভারতে গিয়ে আহলেহাদীছদের জন্য তাঁর প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের নায়করা যারা সেদিন তাঁকে বিতাড়িত করেছিল তারাই এখন বিলুপ্তপ্রায়।

এরপর মুরব্বী সংগঠন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সাথে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দূরত্ব সৃষ্টির প্রভাব আরো তীব্রতর হ'তে থাকে। অবশেষে তা এমনই দানা বেঁধে ওঠে যে, ডঃ গালিবের কর্মদক্ষতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চেতনা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, সর্বস্তরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পরও ১৯৮৯ সালের ২১ শে জুলাই জমঈয়তের 'ওয়ার্কিং কমিটি'র বর্ধিত সভায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে এবং একই বছর ২৮ ডিসেম্বর 'জমঈয়তে শুব্বানে আহলেহাদীছ' নাম দিয়ে নামকাওয়াস্তে একটি যুবসংগঠন কায়েম করে।[২] প্রায় ১২ বছরের প্রতিষ্ঠিত একটি গতিশীল যুবসংগঠনকে পৃথক করে দিয়ে আহলেহাদীছ জামা'আতের মাঝে এভাবেই তারা সাংগঠনিকভাবে ফাটল সৃষ্টি করেন। অতঃপর যুবসংঘ একপক্ষীয়ভাবে দীর্ঘ সোয়া পাঁচ বছর ঐক্যের প্রচেষ্টা চালানোর পরও জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেননি। বিশেষ করে যুবসংঘের 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের ৫ জন দায়িত্বশীল '৮৯ সালে ১৯ নভেম্বর তৎকালীন জমঈয়ত সভাপতি প্রফেসর ডঃ আব্দুল বারী (রহঃ)-এর সাথে ঢাকায় তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করে কী কারণে এবং কোন্ অপরাধে 'যুবসংঘ'-এর সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করা হ'ল- জানতে চাইলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এছাড়া একই বছরের ১৯ অক্টোবর, ১৪ নভেম্বর, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০ সালের মার্চ ও ১৯৯১ সালের ২৬ নভেম্বর প্রভৃতি সময়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়েও কোন ফল হয়নি। অবশেষে বাধ্যগত অবস্থায় ১৯৯৪ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধীদের সম্মেলনে মুরব্বী সংগঠন হিসাবে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের উক্ত নীতিহীন ও চেতনাহীন একপেশে যিদের কারণেই জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুস্তাছির আহমাদ রহমানী ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম জমঈয়ত থেকে বের হয়ে ১৯৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারী 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম' নামে একটি পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন। এছাড়া দেশের আরো সুপরিচিত বহু আলেমকে জমঈয়ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যাঁরা আহলেহাদীছ নীতিতে ছিলেন আপোসহীন।

তারপর থেকে ডঃ গালিব মূল সংগঠনসহ তিনটি অঙ্গ সংগঠন সফলভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। একই সাথে চলতে থাকে তাঁর গবেষণাধর্মী লেখনী এবং তেজোদ্দীপ্ত বাগ্মীতা। তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ও বিদেশী দাতা সংস্থার সৌজন্যে শহরে ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকশত জামে মসজিদ এবং যেলা ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সমূহে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বড় বড় মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ। প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'। এখান থেকেই প্রকাশিত হ'তে থাকে **'মাসিক আত-তাহরীক'** সহ মূল্যবান পুস্তিকা

২. *সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়, 'সভায় আহলে হাদীস যুবসঙ্ঘ এবং আহলে হাদীস ছাত্র আন্দোলনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় সংস্থার সাথে জমঈয়তের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়'। দেখুনঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৩০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৪ জুলাই ১৯৮৯, পৃঃ ৫, কলাম ৩।*

সমূহ। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আহলেহাদীছের উপরে কৃত সর্বপ্রথম ডক্টরেট থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'। প্রকাশিত হয় বিশুদ্ধ রেফারেন্স সমৃদ্ধ নামায শিক্ষা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, হাদীছের প্রামাণিকতা, ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন সহ বহু গবেষণাধর্মী, সংস্কারমূলক মূল্যবান পুস্তক সমূহ। প্রতিষ্ঠিত হয় আহলেহাদীছদের সর্বপ্রথম 'ফাতাওয়া বোর্ড'। শুরু হয় নিয়মিত বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা। এসবের মাধ্যমে মৃতপ্রায় আহলেহাদীছ সমাজ আবার জেগে উঠতে শুরু করে। ফলে কুচক্রীরা অন্য পথ ধরে।

সংগঠনে অনুপ্রবেশ করা ঐ কুচক্রী মুনাফিক অতিভক্তি দেখিয়ে সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয় এবং ১৯৯৮ সালে যখন 'আল-কাওছার হজ্জ কাফেলা' প্রতিষ্ঠা করা হয় তখনও তার সহযোগী হিসাবে আরো কয়েকজনকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করে নিজের হাত শক্ত করে নেয়। অতঃপর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনের অর্থনৈতিক সকল বিভাগকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। সংগঠনের আমীরে জামা'আত ও নায়েবে আমীরের বিরুদ্ধে কর্মীদের মধ্যে অত্যন্ত সুকৌশলে নানা ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালাতে থাকে। অবশেষে ঐ কুচক্রীকে ২০০১ সালের ২৩ জুন সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। সাময়িক এই অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় গতিশীল সংগঠন চরমভাবে ধাক্কা খায়। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মাঝপথে অর্থনৈতিকভাবে সংগঠনকে মেরুদণ্ডহীন করে এর বিনাশ সাধন করা। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। ফলে সংগঠনের উপরে শত্রুরা কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়; বরং হোঁচট খেয়ে সংগঠন আরো সচেতন ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

জঙ্গীবাদের উত্থানঃ টার্গেট আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নস্যাত করা

উপরোক্ত যাবতীয় অপকৌশল ব্যর্থ হ'লেও শত্রুরা পিছপা হয়নি; বরং এ আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আরো গভীর চক্রান্ত শুরু করে। আহলেহাদীছ ঘরে জন্ম নেয়া কতিপয় শারঈ জ্ঞানহীন মূর্খ উন্মাদমস্তিষ্ক তরুণকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে 'জঙ্গী' সাজানো হয়। ক্ষমতা থাকতেই যেন আহলেহাদীছদেরকে ধূলিস্যাৎ করা যায়, এ উদ্দেশ্যে তারা অতি সূক্ষ্ম মিশন পরিচালনা করে। আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ২০০২ সালে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত 'যুবসংঘের' দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনেই উক্ত বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমাদের যে আন্দোলন চলছে, অন্যরা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এমনটি মোটেও ভাববেন না। ...আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলার যমীনে সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাক এটা কি অন্যরা পসন্দ করবে? আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন! জিহাদ ও কিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনিই আপনার সংগঠন খতম করা। ইসলামী দল বাংলাদেশে তো আরো রয়েছে, তাদের মধ্যে তো এগুলো নেই! কারণ টার্গেট আপনি। অতএব সাবধান হয়ে যান কোন ধোঁকায় পা দিবেন না'। সেদিনের তাঁর এই আশংকা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিফলিত হ'তে থাকে।

দেশে অগণিত ইসলামী সংগঠন থাকলেও কেবল দেশের যে প্রান্তেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র শাখা আছে, কর্মী আছে সেখানেই জঙ্গীরা হানা দেয় এবং নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে ইসলামের চিরশত্রু এই জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনি, বক্তব্য, সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত থাকায় তাদের সেই ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়; বরং এই কঠিন মুহূর্তে ডঃ গালিবের **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** এবং **'হাদীছের প্রামাণিকতা'** বই দু'টি প্রকাশিত হ'লে নীল নকশা প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্য হিতে বিপরীত হয়। ফলে কর্মীদের মধ্যে এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৪ সালের এপ্রিলের ১ ও ২ তারিখের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার মাধ্যমে।

কিন্তু সংগঠনের এই অগ্রগতি ও পুনরুজ্জীবনকে সইতে না পেরে দুরভিসন্ধির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়। ২০০৪ সালের ঐ এপ্রিল মাস থেকেই সর্বহারা নিধনের অজুহাতে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আহলেহাদীছ সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং কেন্দ্রস্থল খোদ রাজশাহীতেই জঙ্গী তৎপরতাকে প্রকাশ্য রূপ দেওয়া হয়। যদিও রাজশাহীর তাহেরপুর, বাগমারা ও নওগাঁর আত্রাইয়ের চেয়ে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গাতে সর্বহারাদের উৎপাত ছিল আরো অনেকগুণ বেশী। কিন্তু সে সমস্ত স্থানগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তু হয়নি। আসলে আহলেহাদীছদের বৃহত্তর এলাকাগুলোকে কলুষিত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

অতঃপর সমাজে প্রচলিত যে সমস্ত শিরক-বিদ'আত ও বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছরা আপোসীনভাবে সংগ্রাম করে থাকেন। পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট 'জঙ্গী'দের দ্বারা ঐ সমস্ত স্থানগুলোতে বোমা হামলা করে নেওয়া হয়, যেন বিশ্ববাসীকে দেখানো যায় যে, আহলেহাদীছরাই এসমস্ত নাশকতামূলক কাণ্ড পরিচালনা করে থাকে, যেন আন্তর্জাতিক চক্রের কাছে

আহলেহাদীছদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে ওয়াহাবীদের মত একেবারে নির্মূল করা যায়। সেই সাথে এ সমস্ত জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে যেন আর কোনদিন আহলেহাদীছরা কথা বলতে না পারে। এভাবে ইহুদী-খ্রীষ্টান প্রভুদের নিকট আহলেহাদীছদেরকে 'ওয়াহাবী' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হয়।

অতঃপর শুরু হয় দুর্নীতিবাজ প্রশাসনিক কর্মচারীদের যোগসাজশে বিভিন্ন কোর্টে পরিকল্পিত মিথ্যা স্বীকারোক্তি নেওয়ার পালা। সেই সাথে কুচক্রীদের এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা মিডিয়ায় মিথ্যা সিন্ডিকেটেড রিপোর্ট করিয়ে সারা বিশ্বে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে 'চরমপন্থী সংগঠন' হিসাবে চিহ্নিত করার ন্যক্কারজনক অপচেষ্টা চালায়। একদিকে একটি মহলের গভীর চক্রান্ত এবং মিডিয়ার মিথ্যাচার, অন্যদিকে বিদেশী মোড়লদের ইশারা, সবমিলিয়ে অবশেষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। মিথ্যা মামলা চাপানো হয় প্রায় ডজন খানেক। এছাড়া কেন্দ্র ও যেলা নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে জঙ্গী বলে থানায় তালিকা দিয়ে ও পেপারিং করে পুলিশ ও র‍্যাব দ্বারা গ্রেফতারী পরোওয়ানা করা হয়। এমতাবস্থায় ভীতবিহ্বল হয়ে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের রচিত বই-পুস্তকও অনেকে পুড়িয়ে বা পানিতে ফেলে দেন।

প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করে দিয়ে হুমকির মুখে ফেলা হয়। চার শতাধিক ইয়াতীমের খাদ্য বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে পথে নামিয়ে দেয়া হয়। ইয়াতীমদের পরিচালনা করছিল কুয়েত ভিত্তিক ইসলামী সংস্থা 'রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি'। এই সংস্থাটি বিশেষতঃ আহলেহাদীছ সমাজে মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীম খানা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, দাঈ, ইমাম নিয়োগ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছিল। আহলেহাদীছ সমাজের এই উন্নতি বরদাশ্ত করতে না পেরে সেটি বন্ধের ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে।

এছাড়া প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ৬ মে '০৫ শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানে মহাসম্মেলন করার অনুমতি দেয়ার পর নজীরবিহীনভাবে মাত্র একদিন আগে আকস্মাৎ মাঠ বরাদ্দ বাতিল করে দিয়ে সম্মেলন পণ্ড করে দেয়। ফলে লক্ষাধিক জনতা সকল প্রস্তুতি গ্রহণের পর বাধাগ্রস্ত হয়, অপচয় হয় প্রচুর অর্থ-সম্পদ। পাবনা টাউন হলে ২২ জানুয়ারী '০৬ সমাবেশ করার অনুমতি দেয়ার পর শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে 'উপরের নির্দেশ' বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ১৪ই এপ্রিল এবং ২রা মে বগুড়া গাবতলীর সমাবেশও বন্ধ করা হয়। নওগাঁ যেলার সাপাহারে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হ'লে একইভাবে বন্ধ করা হয়। সম্প্রতি ঢাকার পল্টন ময়দানে ২রা জুন '০৬ জাতীয় মহাসম্মেলন করার জন্য দুই মাস পূর্বে দরখাস্ত করে সকল প্রকার প্রস্তুতি নেয়া হ'লেও ঐ শত্রুমহল সমাবেশ বন্ধ করার জন্য ৩রা জুন তাদের সম্মেলন করার তারিখ ঘোষণা করে এবং আহলেহাদীছদের সম্মেলন হবে না বলে সারা দেশে বিভিন্নভাবে প্রচারণা চালায়। এমনকি অনেক পূর্ব থেকেই তারা প্যাণ্ডেল দখল করে ফেলে। তাই বাধ্য হয়ে সেই মহাসম্মেলন পল্টন ময়দানের পরিবর্তে মুক্তাঙ্গনে করতে হয়। এভাবে আরো বিভিন্ন সম্মেলন, সমাবেশ, ইসলামী জালসা বন্ধ করে তারা সারা দেশে আহলেহাদীছদের দাওয়াতী কার্যক্রমকে স্তব্ধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

চেতনা ফিরবে আর কত দিনে!

আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ঐ গোষ্ঠীটির ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে কি? দুর্ভাগ্য যে, আহলেহাদীছ সন্তানদের মস্তিষ্ক এমনভাবে ধোলাই করা হয়েছে যে, তাদেরকে সার্বিক দিক থেকে পঙ্গু করা হ'লেও তারা এখনো বুঝতে সক্ষম নয়। চক্রান্তের শিকড় যে কত গভীরে প্রোথিত তা অনুমান করা খুবই দুঃসাধ্য। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে আহলেহাদীছ সন্তানদের দ্বারাই তাদের আদর্শ, সভ্যতা, চেতনা, বৈশিষ্ট্য, মেধা, মনন তাদের অর্থ-সম্পদ, প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা সবকিছুই ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের এ পরিকল্পনার কাছে খ্রীষ্টান লর্ড মেকলের পরিকল্পনাও যেন ব্যর্থ। যেমনভাবে ইংরেজরা উপমহাদেশে জন্ম নেয়া একশ্রেণীর মানুষের মস্তিষ্ক ধোলাই করে তাদের দ্বারাই ভারতবর্ষের মানুষের উপর নির্যাতন করেছিল। অনুরূপভাবে তাদের মেধাকে এমনভাবে হরণ করা হয়েছে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'ই যে প্রাচীনতম, নির্ভেজাল ও একমাত্র মুক্তির আন্দোলন তা আজ তারা বুঝতে পারছে না। ইসলামের নামে আবির্ভাব হওয়া অসংখ্য আন্দোলনের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে কোনরূপ তুলনা চলে না তাও ভুলে গেছে। এমনকি পার্থক্য করার অনুভূতিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন দিবস ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন, বিদ'আতী অনুষ্ঠান ও শিরকী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তারা আজ আক্বীদা-আমল সবই নষ্ট করছে। আর এ কারণেই তাদের সামনে 'আহলেহাদীছরা মিথ্যুক', 'ইহুদীদের ক্রীড়নক' ইত্যাদি বলে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উন্মুক্ত সমাবেশে সমগ্র আহলেহাদীছকে গালি দিলেও তাদের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না; বরং তারা তাদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন, সমাবেশে হাযির হচ্ছেন এবং গর্বের সাথে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন।

এই আদর্শিক চেতনা ধ্বংস হওয়ার কারণেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের অমর নায়ক মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)-এর রেখে যাওয়া 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' আজ

নামমাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তার সাংগঠনিক ভিত্তি প্রায় অস্তিত্বহীন। তিনি যে আমানত রেখে বিদায় নিয়েছিলেন আজ তা বিলুপ্তপ্রায়। তাঁর রচিত ৩০-এর অধিক গ্রন্থ আজ উই পোকার খোরাক। বিশেষ করে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা 'সূরায়ে ফাতেহার তাফসীর' আজও মানুষের মুখ দেখেনি। মাত্র কয়েকটি বই বাজারে চালু থাকলেও খুবই কম। অথচ 'জমঈয়তের' নিজস্ব প্রেস আছে কিন্তু প্রকাশনার উন্নতি হয়নি। প্রচুর অর্থ-সম্পদ আছে কিন্তু সাংগঠনিক ও সামাজিক উন্নতি হয়নি। এভাবে ক্রমেই একদিকে জমঈয়তে আহলে হাদীসকে ধ্বংস করা হচ্ছে আর শত্রুরা আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছে। অন্যদিকে ডঃ গালিবের সক্রিয় সংগঠন আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর চালানো হচ্ছে লোমহর্ষক নির্যাতন। এরপরও যখন বিভিন্ন এলাকায় বৈঠক, খুৎবা, সভা, সম্মেলন করতে যাওয়া হয়, তখন মাথা বিকৃত ঐ কথিত আহলেহাদীছরা গর্বের সাথে বলে, আমরা জমঈয়ত করি, আমরা কাফী ছাহেবের সংগঠন করি এখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবেন না ইত্যাদি। এ সময় বেদনায় অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। প্রকৃত কথা হ'ল, ঐ দাবীদাররা জমঈয়তের নামটুকুও জানে না, বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে তাও জানে না, কোনদিন সাংগঠনিক বৈঠক করে না, সামান্যতম সহযোগিতা করে না, কোন কনফারেন্সেও যোগদান করে না, পত্রিকা পড়ে না, ওশর-যাকাত, ফিৎরা দিয়ে সংগঠনকে সহযোগিতা করে না, কোনপ্রকার খবরও রাখে না। কারণ তারা জড়িত অন্য সংগঠনের সাথে, যেখানে তারা সময়, শ্রম, অর্থ-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। এরাই হ'ল মাথা বিকৃত কথিত আহলেহাদীছ, ভ্রান্ত ইসলামী দলের ক্রীড়নক। এ কী সাংঘাতিক পরিকল্পনা!! এভাবেই আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাংলার যমীন থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে!

ফিরে আসুন আপন মনযিলে!

নেতৃত্ব পূজারী নামধারী কতিপয় আহলেহাদীছ ব্যক্তি, যারা জমঈয়তের নাম ভাঙ্গিয়ে অন্য দলের সাথে এখনো জড়িত, তারা জানে না যে সেই তথাকথিত ইসলামী দল সম্পর্কে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) কী বলেছেন, ঐ বশংবদরা তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না।

উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে গাইবান্ধার জনৈক মৌলভী ছাহেব পত্র দিয়ে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)-কে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার আহ্বান জানান। ফলে তিনি **'জামাতে ইসলামী'তে আমার যোগদান অসম্ভব কেন?** শিরোনামে মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীছে' সেই পত্রের জওয়াব দিয়েছিলেন। এছাড়া তার পূর্বে 'ইছলামী জামাত বনাম আহলে হাদীছ আন্দোলন' শিরোনামে একটি লেখায় তিনি উক্ত দলের কঠোর সমালোচনা করেন।[৩] নিম্নে তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হ'লঃ

(ক) 'মওদূদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার এবং তাঁহার দলের মিলন কেন্দ্র হইতে পারে, কিন্তু মুছলিম জাতির জন্য নয়। 'জামাতে ইসলামী'তে সকল দলের মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক (মিথ্যা)। ...আহলে হাদীছ আন্দোলন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত'।[৪]

(খ) 'আহলে হাদীছের কর্তব্য কি, তাহাই বা মওদূদী ছাহেব জানিলেন কিরূপে? তিনি আহলে হাদীছ আন্দোলনকে যদি সঠিক ও সত্য জানিতেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আহলেহাদীছ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের আন্দোলনকে জোরদার করিতে চেষ্টিত হইতেন না কি? এই আন্দোলনে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই কি তিনি একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন শুরু করেন নাই। যে ব্যক্তি আহলেহাদীছ মতবাদকে (আদর্শ) বিশ্বাস করে না, তাঁহার নেতৃত্ব কোন ঈমানদার ও হায়া সম্পন্ন আহলে হাদীছের পক্ষে স্বীকার করা ও তাঁহার আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি সম্ভবপর?'[৫]

(গ) আরো বলেন, 'আমার পক্ষে এবং কোন আহলেহাদীছের পক্ষে এ আমন্ত্রণ স্বীকার করার উপায় নাই'।[৬]

(ঘ) সবশেষে তিনি বলেন, 'অতএব কোন আহলেহাদীছের পক্ষে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আহলেহাদীছ জামা'আত পরিত্যাগ করা এবং অন্য জামাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়'।[৭]

'জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর আমৃত্যু কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রহঃ) উক্ত ইসলামী দলকে ইসলাম বহির্ভূত শী'আ ফের্কার উপদল 'যায়দিয়ার' সাথে তুলনা করে বলেন, 'যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করা, কেতাব ও সুন্নাহ মুতাবেক শাসন পদ্ধতি চালু করার কথা প্রকাশ করেন তারাও সহীহায়েনের (বুখারী ও মুসলিম) হাদীস মুতাবেক আমল করতে আগ্রহী নন এবং তাদের মাযহাবের বিপরীত সহীহায়েনের বহু হাদীসকে তারা মানসূখ বলে অথবা ওগুলোর ভিন্নার্থ করে। এদের হাতে কোনদিন শাসন ক্ষমতা এলে, এরাও শিয়া যায়দিয়াদের ন্যায় বোখারী ও মুসলিমের হাদীস মুতাবেক আমল করায় বাধা দিবে- এ আশংকা মুক্ত নয়'।[৮] অন্যত্র তিনি এ দলটিকে ইসলাম

৩. *দ্রঃ তর্জুমানুল হাদীছ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৪৩-১৪৮ এবং শ্রাবণ ১৩৬২, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪১-৪৫।*
৪. *মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী, একটি পত্রের জওয়াব, প্রকাশকঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ ১২।*
৫. *ঐ, পৃঃ ১০।* ৬. *ঐ, পৃঃ ১৪।*
৭. *ঐ, পৃঃ ১৪।*
৮. *ঐ, ধর্ম ও রাজনীতি (ছাপাঃ মার্চ ১৯৮৯), পৃঃ ১০।*

বহির্ভূত ফের্কা 'খারেজী'র সাথে তুলনা করেছেন।[৯]

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বলেই এখানে কেবল মাওলানা কাফী ও আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রহঃ)-এর মাত্র কয়েকটি উক্তি পেশ করা হ'ল। মূলতঃ এই মতবাদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের আহলেহাদীছ মনীষীগণ এবং হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণও কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এছাড়াও 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর গঠনতন্ত্রের ৮নং ধারায় **'মুহাম্মদী জামাতে প্রবেশ ও আহলে হাদীস আন্দোলনে যোগদান করার যোগ্যতা'** শিরোনাম দিয়ে (গ) দফায় বলা হয়েছে, 'যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আক্বীদা, আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব আহলে হাদীস আন্দোলন হইতে ভিন্ন তাহার কোন সদস্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না'।[১০] লক্ষ্য করুন! এখানে কতটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' বা মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে অপপ্রচারের কোন সুযোগ নেই। যারা এধরনের মিথ্যা প্রচারণা চালায় তারা আত্মপ্রবঞ্চক, সম্মুখ শত্রু বৈ-কি। কারণ আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এটাই রাজনৈতিক আন্দোলন। এখান থেকে ছিটকে যেয়ে অন্য কথিত ইসলামী দলে গিয়ে কেউ আহলেহাদীছ পরিচয় দিতে পারে না। এটা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী, স্বয়ং জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্যের বিরোধী, জমঈয়তের মূলনীতি ও গঠনতন্ত্রেরও বিরোধী। তাই এমন দ্বিমুখী কোন স্বেচ্ছাচারীর পক্ষে আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দেওয়া মহা অন্যায়। যারা আজও এ প্রবঞ্চনার সমুদ্রে ডুবে আছে, আমরা তাদেরকে আত্মসচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই।

এক্ষণে যারা ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী বিভিন্ন দলে শামিল হয়ে নিজেকে আহলেহাদীছ বলে দাবী করছে, তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার কথা হ'ল- ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জীবনে যিনি কেবল অহি-র বিধানের অনুসরণ করবেন তিনিই আহলেহাদীছ বলে গণ্য হবেন। দ্বিমুখী জীবনের জন্য পরকাল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ *(বাক্বারাহ ৮৫-৮৬)*। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত যেমন হুবহু কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আদায় করতে হবে, তেমনি সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই ঐ কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী হ'তে হবে। কারণ উক্ত ইবাদতগুলো যেমন শরী'আতে রয়েছে তেমনি এগুলো বিষয়েও শরী'আতে নির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর খলীফাগণ তা অতি সুন্দরভাবে দেখিয়ে গেছেন। তাই জীবনের একাংশে রাসূলের আদর্শ আর অন্য অংশে ইহুদী-খ্রীষ্টান কাফেরদের আদর্শ মেনে চলা একজন মুসলমানের রীতি নয়; বরং উভয় ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ মেনে চলতে হবে। এটাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের চিরন্তন নীতি। যেমনভাবে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) **'আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য'** নামক পুস্তিকায় বলেন,

'আহলে হাদীসগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্য শ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাহারা উল্লিখিত নীতিসমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদিগকে আহলে হাদীস রূপে গণ্য করা যেরূপ অন্যায়, তাঁহাদের আহলে হাদীস হইবার দাবীও তদ্রুপ অর্থহীন'।[১১]

এছাড়া জমঈয়তের গঠনতন্ত্রের ঐ ৮নং ধারার (ঘ) দফায় এই জঘন্য অভ্যাসকে নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে, 'যে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহে, রাসূল (ছাঃ)-এর বিশ্বজনীন নেতৃত্বে, কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌমত্বে এবং মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্যে আস্থাসম্পন্ন নয়, সে সকল প্রতিষ্ঠানে মুহাম্মদী জামা'আত-এর কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না'।[১২]

এখানেও লক্ষ্যণীয় উক্ত বক্তব্যে ও গঠনতন্ত্রে কতটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আর কী হ'তে পারে। সংগঠনের মূলনীতি, গঠনতন্ত্র ও আদর্শ বিরোধী ব্যক্তি কি ঐ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করতে পারে? নাকি সেই সংগঠনের সদস্য হ'তে পারে?

অতএব বুঝা গেল ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা আহলেহাদীছ আন্দোলনের চিরন্তন নীতির কোন পরিবর্তন নেই। এই দিকেই যেমন যুগে যুগে মহান সংস্কারকগণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি এদেশে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)ও সেদিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও সেই নীতিরই একজন আহ্বায়ক।

এক্ষণে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে, জমঈয়তে আহলে হাদীসের অনুমতি ও সমর্থন নিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮০ সাল থেকে কেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হ'ল? কেন আব্দুল মতীন সালাফীর মত একজন বরেণ্য আলেমকে এদেশ থেকে বের করে দেয়া হ'ল? কেন ১৯৮৯

৯. *ঐ, পৃঃ ১৪।*
১০. *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসঃ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র (৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৮০ ইং), পৃঃ ৭।*
১১. *ঐ, পৃঃ ৪; আহলেহাদীছ পরিচিতি (ছাপাঃ ১৯৯২), পৃঃ ১৫৪-৫৫।*
১২. *ঐ, পৃঃ ৭।*

সালের ২১ জুলাই যুবসংঘের সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা হ'ল? এর উত্তর একটাই আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা এবং বলিষ্ঠ ঐক্য বিনষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্রই ছিল এর মূল কারণ, আর অন্য কিছু নয়। নইলে জমঈয়তের গঠনতন্ত্রের নীতিকে বাস্তবায়ন করা হ'লে আজ যেমন শত্রুরা সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হ'ত, তেমনি তাদের এজেন্টরাও আহলেহাদীছ সমাজ থেকে বিতাড়িত হ'ত।

বস্তুতঃ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্রের সেই আপোসহীন নীতিকে বাস্তবায়ন করাই ছিল ডঃ গালিবের একমাত্র অপরাধ(!)। আদর্শচ্যুত আহলেহাদীছ সন্তানদেরকে নিজেদের ঘরে ফিরিয়ে এনে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে গতিশীল করাই ছিল তাঁর অন্যায়(!)। কথিত ইসলামী রাজনীতি আর পাশ্চাত্যের জাহেলী মতবাদে জড়িয়ে পড়া মুসলিম সন্তানদের সাক্ষাৎ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাই ছিল তাঁর মস্তবড় ভুল (!)।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকদের মাঝে প্রচার রয়েছে যে, ডঃ গালিব আহলেহাদীছের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন। যদিও ঐ প্রচারকরা বিভিন্ন আদর্শিক দলের সাথে জড়িত। উক্ত মন্ত্র ছড়িয়ে আহলেহাদীছ সমাজকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অথচ এটা নিকৃষ্ট মিথ্যাচার। চক্রান্তও বটে। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল- ডঃ গালিবের জাগরণ সৃষ্টিকারী আন্দোলনের ছোয়া পেয়ে যেন আহলেহাদীছগণ পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হ'তে না পারে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল: 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে যাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল তারা কিভাবে ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করলেন? এরপরও ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'যুবসংঘ' অসংখ্যবার চেষ্টা চালালেও সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়নি। ডঃ গালিব সেদিনই মুরব্বী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, যেমনটি 'জমঈয়ত' যুবসংঘের সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণার কিছুদিন পরেই ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর নতুন করে 'জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' নামে তার যুব শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তিনি এমনটি না করে বরং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ঐক্যের প্রচেষ্টাই করে গেছেন সুদীর্ঘ সোয়া পাঁচ বছর যাবৎ। এক্ষণে কাদের ভূমিকায় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, অপরাধটা কাদের তা নির্ণয় করবেন সুবিবেচক মহল।

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত কারণ থাকার ফলে দীর্ঘদিন পর ১৯৯৪ সালে ডঃ গালিব পৃথকভাবে মুরব্বী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করে যদি অপরাধী হয়ে থাকেন তাহ'লে বিগত ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হয়। প্রখ্যাত আলেম আপোসহীন সংস্কারক মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব দেহলভী কর্তৃক ১৮৯৫ সালে ভারতে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর উক্ত সংগঠন থাকার পরও ১৯০৬ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী প্রমুখ কর্তৃক 'অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠা হয়। আবার ১৯১৪ সালে মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ ও আবদুল লতীফ প্রমুখ কর্তৃক 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ বাঙ্গালা ও আসাম' প্রতিষ্ঠা হয়। এ সমস্ত সংগঠন থাকা সত্ত্বেও মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) ১৯৪৬ সালে ২০ এপ্রিল 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয় উপরোক্ত দুই সংগঠনের সদর দফতর ছিল কলিকাতা ১নং মারকুইস লেন, মিছরীগঞ্জ মসজিদে। তাহ'লে একটি সংগঠন থাকা সত্ত্বেও আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা কি সকলেই অপরাধ করেছেন? তাহ'লে তাঁদের বিচার করবে কে? মূলতঃ তাঁদেরকে যে কারণে নতুন সংগঠন করতে হয়েছিল, ডঃ গালিবও ঠিক একই কারণে পরিস্থিতির দাবীতে তা করতে বাধ্য হয়েছেন। মূলকথা হ'ল- আহলেহাদীছদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আজ উক্ত প্রশ্নগুলো বারবার তোলা হয়।

তৃতীয়তঃ ঐক্যের বিষয়। আহলেহাদীছদের বৃহত্তর স্বার্থে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' উক্ত সম্পর্কহীনতার পর থেকে যেমন দীর্ঘ দিন যাবৎ বারংবার ঐক্যের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তেমনি মুরব্বী সংগঠন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেও ২০০৩ সাল পর্যন্ত একাধিকবার ঐক্যের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। তবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের চিরন্তন নীতিকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে ঐক্যের জন্য এখনো এ সংগঠন উদারপ্রাণ। যদিও ব্যথিত জনতার আক্ষেপ- ঐক্য হবে কার সাথে! মাওলানা কাফী ছাহেবের রেখে যাওয়া সেই 'জমঈয়ত' কি এখন আছে? এখন তো সেটা আদর্শহীন ও স্পন্দনহীন মৃতকল্প নদীর ন্যায়, যেথায় রয়েছে কেবল যিদ ও হিংসার ধূ ধূ বালুচর। 'আন্দোলন'-এর নৌকা তো তার বুকে চলবে না। বাংলাদেশের কোন দল কি তাদের পুরানো দল মৃত মুসলিম লীগে যোগ দিবে?

চতুর্থতঃ কতিপয় লোক যখন কোন ইস্যু পায় না তখন বলে থাকে, আহলেহাদীছদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কেও কোন তৎপরতা নেই, তারা কেবল মাসআলা-মাসায়েল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কেউ বলে, দেশে অন্য কোন ইসলামী রাজনৈতিক দল না থাকায় আমরা তাদের সাথে জড়িত ইত্যাদি। আমরা মনে করি, এটা আহলেহাদীছদেরকে বিভ্রান্তিকর ইসলামী রাজনীতির দলে ভিড়ানোর কৌশল মাত্র। কারণ তারা তো কেবল নোংরা 'গণতন্ত্রে'র ভোটাভুটিকেই রাজনীতি মনে করেন। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংস্কার এবং সমাজ সংস্কারকে তারা অতি তুচ্ছ মনে করেন। ১৯৪১ সাল থেকে এযাবৎ রাজনীতি করে তারা ইসলামের কতটুকু উপকার করতে পেরেছেন? বরং ইসলামী রাজনীতির ভুল ব্যাখ্যা

দিয়ে তারা খোদ ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক দর্শন যেমন অতুলনীয় তেমনি রাজনৈতিক ইতিহাসও সমুজ্জ্বল। তাই ঐ সব লোকদেরকে আমরা মাওলানা কাফী (রহঃ) ও ডঃ গালিবের লিখিত বইসমূহ পড়তে অনুরোধ জানাই।

সবিশেষ আহ্বানঃ

অতএব আসুন! ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ধ্বংস না করে তাকে শক্তিশালী করি। নিজেদের সময়, শ্রম, অর্থ-সম্পদসহ সার্বিক ত্যাগ তারই জন্য ব্যয় করি। আর অপরের দাসত্ব নয় নিজেদের নেতৃত্বে ফিরে আসি। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এই অভ্রান্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াই। কুরআন-সুন্নাহ্র একমাত্র প্রহরী হিসাবে সর্বস্ব দিয়ে তাকে সংরক্ষণ করি। এই অভ্রান্ত আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি যেন কেউ ধ্বংস না করতে পারে সেজন্য আল্লাহ্র ওয়াস্তে সর্বদা অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করি। আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কেউ কোনদিন সফল হয়নি, বরং তারাই খারেজী, শী'আসহ প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের ফেৎনাকে অবদমিত করেছে, জাল-যঈফ হাদীছ, রায়-ক্বিয়াস ও বিভিন্ন ভ্রান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ চিত্তে আপোষহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিশ্বকে প্রকম্পিত করেছে, দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বিজয়ী নিশান ছিনিয়ে এনেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্যাদাকে সমুন্নত করতেই তারা যুগে যুগে এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পিত। আর এটা কেবল তাদের জন্যই শোভা পায়। কারণ তারা 'আহলুল হাদীছ'। তাদের এই রক্ষণশীল কৃতিত্ব অনুভব করেই ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) (২০২-২৭৫ হিঃ) কালজয়ী মন্তব্য করেছেন যে,

لَوْ لاَهْذِهِ الْعِصَابَةُ لاَنْدَرَسَ الإِسْلاَمُ يَعْنِى أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ

'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[১৩] অনুরূপভাবে ইমাম খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) বলেন, 'বিশ্বপ্রভু সাহায্যপ্রাপ্ত এই কাফেলাকে (আহলেহাদীছ) দ্বীনের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। ...যত দুষ্কৃতকারী শরী'আতে অনুপস্থিত এমন বিষয় যখনই তাতে মিশ্রিত করতে চেয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা 'আহলেহাদীছদের' দ্বারাই তাকে প্রতিহত করেছেন। মূলতঃ তারাই শরী'আতের রুকন সমূহের সংরক্ষণকারী এবং তার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার তত্ত্বাবধানকারী। ...তারাই আল্লাহ্র সেনাবাহিনী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সেনাবাহিনীই সফলকাম'।[১৪]

১৩. *আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৯।*
১৪. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫।*

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতেরও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তিঃ

মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১- ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২- ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ

করা হয়, তা নিম্নরূপঃ ১- সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ-

অর্থঃ (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

'নিশ্চয়ই আমরা ইহা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ-

অর্থঃ 'উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ..

'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে এবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপঃ

১- আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ-

'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২- মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে 'একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্‌ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩- ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাতঃ

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিস্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লাআলী' কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমনঃ

এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি (ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯) যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে-

تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয়ঃ

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

প্রসঙ্গঃ বাউল সাধনা

*গোলাম রহমান**

আমাদের দেশে এক ধরনের মানুষ দেখা যায়, যাদের মাথায় লম্বা কেশ, মুখে লম্বা দাড়ি, গোঁফে মুখ ঢাকা, পরনে ডোরকৌপীন, গায়ে আলখেল্লা। কারো মাথায় ও দাড়িতে জট, কারো পরনে সেলাইবিহীন লাল শালু। কারো ন্যাড়া মাথা আর গোঁফ-দাড়ি কামানো। এরাই আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া, সাঁই, ন্যাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

বাউল মতবাদের উৎপত্তিঃ

ডঃ এনামুল হকের মতে, 'ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে আমাদের ধারণা জন্মেছে যে, নদীয়া জেলা বাউল মতের উদ্ভবের স্থান। কেননা বাংলাদেশে প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল নদীয়া'।[১] তাই বৃহত্তর নদীয়ায় বাউল মতের প্রসার অধিক হয়েছে। ঈশ্বরপুরী, চৈতন্যদেব, অদ্বৈতাচার্য হরি গুরু প্রমুখ ছিলেন এর প্রবক্তা। এদের প্রভাবে সুলতানী ও মোগল আমলে ওলী-আউলিয়াদের ইসলাম প্রচার খুব জোরালো হ'তে পারেনি। বাউল মতবাদের অনুসারী লালন শাহ (আনুমানিক ১৮১৫-১৮৮৬ খৃঃ) ১৮২৩ সালে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন করলে তা বাউল মতবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

ডঃ এম,এ, রহীমের মতে, বাউল মতবাদ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণববাদ ও ছূফীবাদের ফলশ্রুতি। ন্যাড়া ফকীররাই বাউলদের পূর্বসুরী ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। যেসব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে তাদের মাথা মুণ্ডন করে ফেলত তাদের থেকে ন্যাড়া ফকীরদের উৎপত্তি হয়েছে। এসব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং সহজিয়া ভাবধারা নিয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধতে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে তারা বৈষ্ণব সহজিয়াদের অভ্যাস সমূহও গ্রহণ করে। বহু সহজিয়া বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের কেউ কেউ সহজিয়া বিশ্বাসগত মাথা মুণ্ডনের নীতি বজায় রাখে। এরা ন্যাড়া ফকীর রূপে পরিচিতি লাভ করে। তাদের অভ্যাসের সঙ্গে শরীয়তের কোন সম্পর্ক ছিল না।[২]

মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী (রহঃ) বলেন, 'নদীয়ার শান্তিপুরের কাছে বুড়ল গ্রামে মুনশী আব্দুল্লাহ নামক এক লোক ছিল। শ্রী চৈতন্যের মত একজন বড় দার্শনিকের কাছে তর্কে পরাজিত হয়ে মুনশীজী শ্রী চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। শ্রী চৈতন্য তার নাম রেখেছিলেন যবন হরিদাস। আশুতোষ দেব তার বাংলা অভিধানে লিখেছেন, যবন হরিদাস একজন মুসলমান পণ্ডিৎ ছিলেন। শ্রী চৈতন্যের ভক্ত হয়ে 'যবন হরিদাস' নামে খ্যাত হন। এই যবন হরিদাস চৈতন্যের কাছে শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে অশিক্ষিত মুসলমানদের মাঝে এসে প্রচার করতে লাগল হুঁ-হুঁ- বাবারা ভেদ আছে, ভেদ আছে। মৌলভী মাওলানাদের কাছে আসল ভেদ নাই। আসল ভেদ আমাদের কাছে আছে। এই বলে যবন হরিদাস কিছু ভক্ত তৈরী করে ফেলল। এই ভক্তরাই হ'ল বাউল ফকীরের দল।[৩]

এই কথার সমর্থন মিলে সুরজিৎ দাশগুপ্তের লেখায়। তিনি বলেন, 'চৈতন্যদেব হ'লেন বাউলদের আদি গুরু'।[৪] হিন্দু বৌদ্ধ যোগী সন্ন্যাসীদের থেকেই মূলতঃ বাউল সহজিয়া ও ন্যাড়া ফকীরদের উৎপত্তি। ইতিহাসে যাদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় তারা সবাই হিন্দু ছিলেন। যেমন সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত বাউল হ'লেন আদিনাথ, তার শিষ্য মুলনাথ, তার শিষ্য নিত্যনাথ, নিত্যনাথের বন্ধু ও গুরু ভাই ছিলেন মনাই ফকীর। নিত্যনাথের শিষ্য কালাচাঁদ, তার শিষ্য হারাই, তার শিষ্য দীননাথ, তার শিষ্য ঈষাণ এবং ঈশাণের শিষ্য হ'লেন একালের অন্যতম প্রধান বাউল মদন।[৫] লালন ফকীরের প্রধান শিষ্যের নাম গগন ডাকহররকরা। তার অপর বিখ্যাত শিষ্যের নাম হরিনাথ মজুমদার, তার শিষ্য ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।[৬] উল্লেখ্য, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে এদের কোন তথ্য ও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা সমস্তই সপ্তদশ শতাব্দীর পরের।

হিন্দু ধর্মে বর্ণবৈষম্য, উঁচু-নীচু ভেদাভেদের প্রতিকুলে ইসলামের সাম্য ও উদার নীতি-আদর্শ অবলোকন করে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই স্রোতকে বাধা দানের জন্যই শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ঘটান। আর এটা এমন একটা ধর্মমত যা হিন্দুও না মুসলমানও না, বরং নতুন এক অনৈসলামী দর্শন।

বাউল শব্দের উৎপত্তিঃ

'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। ডঃ পঞ্চানন সাহা বলেন, হিন্দী শব্দ 'বাউরা' বা উন্মাদ থেকে বাউল কথাটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, সংস্কৃত 'বাতুন' থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। অন্যদিকে ছূফীরা সাধু ফকীরকে বলে

---

* শিক্ষক, হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা, নাটোর।

১. ফাতেমা ইয়াসমিন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩১।
২. ডঃ এম, এ, রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।
৩. মাওলানা আবু তাহের বর্দ্ধমানী, সাধু সাবধান, পৃঃ ৩-৪।
৪. সুরজিৎ দাশ গুপ্ত, ভারত বর্ষ ও ইসলাম, (কলিকাতাঃ ১৯৯১ ইং) পৃঃ ১০৪।
৫. ঐ, পৃঃ ১০৫।
৬. ঐ, পৃঃ ১০৫।

আউলিয়া। এই আউলিয়া শব্দটি থেকে উদ্ভূত 'আউল' শব্দটি 'বাউল' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই বাউলরা জাত-গাত-হিন্দু মুসলমানে বিচার করে না।[৭] মূলতঃ এরা পাঙ্গাশ ও ক্ষ্যাপা ভাবধারার।

ডঃ এম, এ, রহীম বলেন, বাউল শব্দটি সংস্কৃত 'বাতুন' শব্দ থেকে এসেছে; এর অর্থ 'পাগল বা মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি। এভাবে 'বাউল' নামটি একদা ব্যক্তি বিশেষের জন্য ব্যবহৃত হ'লেও পরবর্তী পর্যায়ে যারা আধ্যাত্মিক উন্মাদনায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকেন, তাদের জন্য উহা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যায়'।[৮]

গুরু শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশঃ

ডঃ তারাচাঁদ বলেন, গুরু ভক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এটা শুরু হয় শী'আদের দ্বারা। আর ছূফীরা এটা গ্রহণ করে। তবে এটা মানতেই হবে যে, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা একটা প্রাচীন ভারতীয় ধারণা। বেশী পেছনে না গিয়েও যে কেউ তা গুহ্য সূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে দেখতে পাবেন। গুরু ও ব্রহ্মচারীর (ছাত্র) মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে অনেক কথা সেখানে বলা আছে। ছাত্র তার গুরুকে তার আপন পিতার চেয়েও বেশী মান্য করবে। ছাত্রাবস্থায় গুরুর প্রতি সর্বতোভাবে অনুগত থাকবে এবং সারা জীবনই আনুগত্য বজায় রেখে চলতে হবে। গুরুকে এমনকি ঈশ্বরের সঙ্গেও তুলনা করা হয়।[৯] বাউলরা তাদের আধ্যাত্মিক গুরুকে এত বেশী মর্যাদা দান করে যে, তারা তার মধ্যে বিধাতার প্রতিমূর্তি দেখতে পায়।[১০]

গুরুই এদের চালিকা শক্তি। গুরু শিক্ষা দিবে, দীক্ষা দিবে, এমনকি সাধন-ভজন সবই গুরু। বাউল ফকীররা বলে,

মন পাগলরে গুরু ভজনা
গুরু বিনে মুক্তি পাবি না।
গুরু নামে আছে সুধা
যিনি গুরু তিনিই খোদা।
মন পাগলরে গুরু ভজনা।[১১]

তাদের এই গানে গুরু আর আল্লাহা একাকার হয়ে গেছে। দু'টি যেন একই সত্তা (নাউযুবিল্লাহ)। হিন্দু শাস্ত্রে যেমন হরির কোন অন্ত নাই। গাছপালা, সাপ ব্যাঙ, পানি সবই হরি। তেমনি বাউলদের গুরুর অভাব নাই। তারা গায়-

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অথিত গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগনন।
গুরু যে তোর বরণ ডালা, গুরু যে তোর মরণ জালা
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা, যে ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন?[১২]

বাউলরা নৈরাশ্যের অন্ধকারে গুরুকে প্রদীপ স্বরূপ মনে করে। আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভের পর্যায়ে তারা মন গুরু ও স্রষ্টা গুরু এ দু'ধরনের গুরুর উপস্থিতি অনুভব করে থাকে। বাউলদের মতে, মন গুরুর আরাধনা স্রষ্টা গুরুর আরাধনায় পর্যবসিত হয়। একটি মুর্শিদী সঙ্গীতে লালন শাহ বলেন, মুর্শিদ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন সম্পদ নাই। মুর্শিদের পদামৃতে সব ক্ষুধা-তৃষ্ণার তৃপ্তি ঘটে। মনে কোন দিবা সংশয় রেখনা, যিনি মুর্শিদ তিনি খোদা।[১৩]

শাস্ত্রহীন বাউল দর্শনঃ

বাউলদের মতে, শাস্ত্র আলোচনা, ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম ও অনুষ্ঠানগুলি মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে টেনে নেয় এবং সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই লালন শাহ বলেন, 'বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার, উদয় হয় না দিনমণি'। একটি বাউল গানে আছে, 'ঘরের মানুষ বসত করে ঘরেতে, বৃথায় তুমি খোঁজ তারে বাহিরে; তোমার নিজের দোষে তুমি চিরকাল ঘুরে মরছ। তুমি গয়া বেনারস ও বৃন্দাবনে ছিলে এবং তীর্থ যাত্রার ছলে তুমি বহু নদ-নদী, বন-উপবন ও অন্যান্য স্থানগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছ; কিন্তু বল এসব জায়গাগুলিতে তুমি যার নাম শুনেছ তার কি কোন চিহ্ন দেখতে পেয়েছ? গোলকধাঁধায় পড়ে তুমি তোমার উপলব্ধির সব ক্ষমতা হারিয়ে বসে আছ; স্বীয় বস্ত্রের সঙ্গে মুক্তা বেঁধে তুমি তারই অন্বেষণে সাঁতার কাটছ। সতর্ক থাকলে তুমি সহজেই মুক্তা পেতে পারতে- কিন্তু অসাবধানে তুমি একে একে সবই হারাচ্ছ; মুক্তা তোমার চোখের এত কাছে চক চক করছে কিন্তু হায় তুমি তোমার চোখ বন্ধ করে রেখেছ এবং কিছুই দেখতে পাও না।[১৪]

বাউলরা বিশ্বাস করে যে, নূর (আলো) ও প্রেম (ভালবাসা, আল্লাহ্‌র শক্তি) পয়গম্বরগণের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর নিজস্ব মূর্তিতে আদম ও সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আত্মরূপে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিরাজমান। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রাসূলুল্লাহর মধ্যে পূর্ণভাবে উপস্থিত। সুতরাং পয়গম্বর হচ্ছেন ইনসানে কামিল (পূর্ণ মানব)। পয়গম্বর ও শ্রীচৈতন্য মহৎ গুরু। বাউলরা

৭. *ডঃ পঞ্চানন সাহা, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা (ঢাকাঃ ২০০১), পৃঃ ৭৭।*
৮. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।*
৯. *ডঃ তারাচাঁদ, ভারতীয় সাংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব (ঢাকাঃ ১৯৯১), পৃঃ ১১১।*
১০. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।*
১১. *সাধু সাবধান, পৃঃ ১৯।*
১২. *ভারত বর্ষ ও ইসলাম পৃঃ ১০৬; হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নতুন ভাবনা, পৃঃ ৮১।*
১৩. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ ও ২৮৭।*
১৪. *ঐ, পৃঃ ২৮৬।*

আল্লাহকে অন্তরের সহজ মানুষ বা মনের মানুষ রূপে অভিহিত করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ছূফী তরীকার বিভিন্ন স্তরের (মোকাম সমূহ) উল্লেখ বাউল সঙ্গীতেও পরিলক্ষিত হয়। এসব গানের একটিতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের কেউ যদি অন্তরের মানুষের সাক্ষাৎ লাভ করতে চাও তবে সৌন্দর্যের রাজ্যে গমন কর। নাসুৎ, মালকুৎ, জাবরুৎ ও লাহুৎ মোকাম রয়েছে এবং তুমি তাকে এই চার মোকামে বাস্তবে অন্বেষণ কর।' একটি গানে লালন শাহ্ এই চার স্তরের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ গোপনে এসব মোকাম সমূহের দরজায় দীপ্তিমান রয়েছেন। স্রষ্টার আলোর অবস্থান লা (লাহুৎ) মোকামে এবং হাউতে তার নবুতের ধ্বনি (নওবৎ) সঙ্গীত অর্থাৎ দৃশ্যমান হওয়ার নিদর্শন শোনা যায়।

অন্তরের মানুষ সম্পর্কিত বাউলদের বিশ্বাসে প্রেমাস্পদ সম্পর্কিত ছূফী দর্শনের সঙ্গে উপনিষদের পরমাত্মাও সহজিয়াদের সহজ ভাবধারার সংমিশ্রণ রয়েছে। মানব দেহ হচ্ছে আবাস স্থান আর অন্তরের মানুষের আসন হচ্ছে মানব হৃদয়। কেবল প্রেমোন্মাদনার মাধ্যমেই অন্তরের মানুষের স্পর্শ লাভ করা যেতে পারে। বাউল বলেন, আমার মনে হয় ইতিমধ্যে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। অন্যথা কেন আমি মাঝে মাঝে অন্তরের মধ্যে এত দুঃখ-কষ্ট অনুভব করি? যখন আমি শান্ত মনে চুপ করে থাকি, তখন আমি যেন শুনতে পাই, কেউ ভিতর থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলছে, এখানে আমি, আমি এখানে, আমার অন্তর আকাশের স্বপ্নালোকে। আমার মনে হয়, আমি যেন কাউকে আমার পার্শ্বে আগমন করতে দেখি। সে ভ্রমণ করে, সে কথা বলে, সে হাসে, সে অন্য শত শত খেলায় মাতে। আমি যদি তাকে ছেড়ে একা থাকতে চাই, আমি পারি না। যেন মনে হয়, সে আমার অন্তরের নিভৃত আঙ্গিনায় তার বাসা বেঁধে আছে।

পরম স্রষ্টার সঙ্গে ব্যক্তির একাত্ম হয়ে যাওয়ার এই বাউল ভাবধারায় ছূফীদের ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহর শেষ বা চরম স্তরের প্রতিধ্বনি রয়েছে। ছূফী মরমি কবি জালালুদ্দীন রূমী বলেন,

'সেই শুভক্ষণ যবে তুমি আমি বসি দোহে প্রাসাদ ভবনে,
দুই রূপে, দুই দেহে, কিন্তু তুমি আমি এক প্রাণে এক মনে।'[১৫]

বাউল এ বিশ্বাসে চালিত হয় যে, তাঁর দেহ হচ্ছে পরম সত্তার আবাস স্থল এবং অন্তর হচ্ছে বিধাতার আসন। তিনি এভাবে এমনকি প্রাথমিক পর্যায়েও বিধাতার সঙ্গে মানুষকে একীভূত করে দেখেন।[১৬]

১৫. ঐ, পৃঃ ২৮৭।
১৬. ঐ, পৃঃ ২৮৮।

বাউল সহজিয়া প্রভৃতি সাধন ভজন পদ্ধতির সাথে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে নানাভাবে প্রচলিত তান্ত্রিক সাধনার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার যোগও খুব নিবিড়। বলতে গেলে এসব কিছুর মূলই হ'ল তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা। পরতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিশিষ্ট সাধন ভজন পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।[১৭]

বাউলদের বেশভূষায় হিন্দু ও মুসলমন দু'ধারারই ঐক্য সাধনার ইঙ্গিত আছে। সংসার বিমুখ শাস্ত্রীয় তত্ত্ববাদী হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত তারা নগ্ন গাত্রে ভস্ম আচ্ছাদন করে কৌপীন পরে না, দেহকে কষ্ট দিয়ে দেহাতীত সত্যের সাধনাও করে না, দেহ আর আত্মাকে পৃথক বলে গণ্য করে না, আবার দেহ ও আত্মাকে অভেদ বলেও মনে করে না। 'আছে তোরই ভিতর অতল সাগর তার পাইলি না মরম'। অর্থাৎ দেহের মধ্যে আত্মার যে সমুদ্র তার মর্ম বোঝা দায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'। বাউলিয়া তত্ত্বে কায়াই হ'ল সমস্ত সৃষ্টির পীঠ; 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। দেহ তত্ত্ব মানলে আর শাসন বিধান কিছুই মানার দরকার হয় না। বিগ্রহ মানার দরকার হয় না, ব্রতাদি মানার দরকার হয় না, শাস্ত্র মানারও দরকার হয় না। যেমন-

কারে বলব কে করবে তা প্রত্যয়
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

উপন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন সম্বন্ধে লিখেছেন, লালন জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে ধর্মে কোন পার্থক্য দেখেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মে কোন বিভেদ বুঝেন নাই। তিনি আল্লাহকে অধর কালা এবং মুহাম্মাদ ও চৈতন্যদেব উভয়কেই সমানভাবে ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মানবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তারাই উদ্ধারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের মধ্যেই ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। লালনের একটি গানে আছে,

যে যা ভাবে সেই যে হয়।
রাম রহিম করিম কালা এক আড্ডা জগৎময়।[১৮]

লালন তার বিভিন্ন গানে হিন্দু মুসলমান, রাম ও রহীম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আর চৈতন্যদেব, গুরু আর আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন ভেদাভেদ খুঁজে পাননি। আসলে পাবে কি করে? সে তো ইসলাম ও মুসলমানের ধার ধারেনি।

[চলবে]

১৭. অজয় রায়, বাঙালা ও বাঙালী (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ইং), পৃঃ ৪৮।
১৮. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পৃঃ ৭৯।

বাকস্বাধীনতা ও প্রতারণা

*যহুর বিন ওছমান**

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ- أَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلٰى إِلٰهِ مُوْسٰى وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِيْ تَبَابٍ-

'ফিরাঊন বলল, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ, হয়ত আমি পৌঁছে যেতে পারব আকাশের পথে, অতঃপর উঁকি মেরে মূসার উপাস্যকে দেখতে পারব। বস্তুতঃ আমি তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফিরাঊনের নিকট সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল সরল পথ হ'তে এবং ফিরাঊনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে' *(মুমিন ৩৬-৩৭; ক্বাছাছ ৩৮)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, ফিরাঊন বলল, আমি এ প্রাসাদ এজন্যই নির্মাণ করতে চাচ্ছি, যাতে আমি আসমানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। অতঃপর যেন আমি মূসা (আঃ)-এর উপাস্যকে দেখতে পাই। আমি জানি যে, মূসা মিথ্যাবাদী। সে বলছে, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বাজে কথা। মূলতঃ এগুলি ছিল ফিরাঊনের প্রতারণা। সে তার প্রজাবর্গের উপর এটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে, সে এমন কাজ করতে যাচ্ছে যার দ্বারা মূসার মিথ্যা প্রকাশিত হবে এবং তার মত তার প্রজাদেরও বিশ্বাস হবে যে, মূসা প্রতারক ও মিথ্যাবাদী।[১]

একই বিষয়ে বর্ণিত সূরা ক্বাছাছ-এর ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ফিরাঊনের ঔদ্ধত্য ও তার আল্লাহ দাবীর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে এভাবে যে, ফিরাঊন তার কওমকে নির্বোধ বানিয়ে তাদের দ্বারা তার দাবী আদায় করে নেয়। সে ঐ ইতর ও অজ্ঞদেরকে একত্রিত করে উচ্চৈঃস্বরে বলে, তোমাদের রব বা প্রতিপালক আমিই, সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত অস্তিত্ব আমারই। মূলতঃ তার এই ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আর অন্যদের জন্য এটাকে শিক্ষণীয় বিষয় করেছেন। ঐ অজ্ঞ লোকেরা তাকে আল্লাহ্‌র আসনে বসিয়ে তার দম্ভ এতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, ফিরাঊন মূসা (আঃ)-কে ধমক দিয়ে বলেছিল, হে মূসা! তুমি যদি আমাকে আল্লাহ বলে মান্য না কর, তাহ'লে আমি তোমাকে কয়েদখানায় বন্দী করব এবং কঠিন শাস্তি দিব। ফিরাঊনের উক্ত দাবী না মানার কারণে ফিরাঊন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ করেছিল, হে হামান! তুমি এমন একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যেখানে উঠে আমি মূসার আল্লাহকে দেখতে পারি।[২]

পৃথিবীর অতীত ইতিহাস মন্থন করে পরিষ্কার ভাবে জানা যায় যে, যুগে যুগে অত্যাচারী ও যালিম শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে মানুষের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা হরণ করেছে এবং জাতির সাথে সর্বোচ্চ প্রতারণা করেছে। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সত্য ও ন্যায়ের পথে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ পেয়েও নবী-রাসূল ও ইমাম-মুজতাহিদগণ যখন আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন, নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন তখন এই ফিৎনার যুগে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পেশ করতে গেলে দাঈদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হবে, এটা কি করে কল্পনা করা যায়? তদুপরি দেশে এমন অনেক আলেম-ওলামা আছেন, যারা ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন, দাওয়াত দেন। তাদের বাকপটুতা এত বেশী যে, ফেরাঊনী হাক-ডাকও এখানে ব্যর্থ। আর অল্পসংখ্যক হক্বপন্থী আলেমের বেলায় তা সর্বাধিক কার্যকর হয়।

আমরা জানি বাকস্বাধীনতা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। অথচ এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ, সুসাহিত্যিক, খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক যখন নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত মানুষের সামনে পেশ করছিলেন, রায়-ক্বিয়াসের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন তখন তাঁর বাকস্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে দেওয়া হ'ল! তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে কারান্তরীণ করা হ'ল, চাপিয়ে দেয়া হ'ল প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলা। এটাই কি সংবিধানে লিপিবদ্ধ মানুষের মৌলিক অধিকার? ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপে দেখা যায় যে, এরূপ প্রহসনমূলক আচরণ ফিরাঊনও করেছিল। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ- حَقِيْقٌ عَلٰى أَنْ لَّا أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ-

'মূসা বললেন, হে ফিরাঊন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের একজন রাসূল। আমার পদমর্যাদা ও শান এই যে, আমি

---

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

১. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৬ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩।

২. ঐ, ১৫ খণ্ড, পৃঃ ৫০৪-৫০৫।

আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং বণী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও' *(আ'রাফ ১০৪-১০৫)*। জওয়াবে ফিরাঊন ও তার সভাসদবর্গ বলল,

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ- يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ-

'ফিরাঊন সম্প্রদায়ের প্রধাণরা বলল, নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি সুদক্ষ যাদুকর। সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ কি'? *(আ'রাফ ১০৯-১১০)*।

সুধী পাঠক! এ দেশের মাটিতে অনেক ইসলামী দল তাদের নিজ নিজ দলীয় কায়দায় দাওয়াত পেশ করে চলেছে। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কোন বিধি-নিষেধ নেই। কারণ এদেশের কথিত বুদ্ধিজীবীরা নাকি 'ধর্মনিরপেক্ষতার' দাবীদার। যেখানে থাকবে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল গোত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদি রাষ্ট্রীয় আইন হয়ে থাকে, তাহ'লে চৌদ্দশ' বছর পূর্ব থেকে চলে আসা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের পথ তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী আহলেহাদীছদের গতিরোধ করা হয় কেন? কেন হক্বপন্থী এ জামা'আতের নেতা-কর্মীদের বিনা অপরাধে আটকিয়ে রেখে নির্যাতন করা হয়? কেন তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়? এটা কোন ধর্মনিরপেক্ষ নীতি? যুগে যুগে ফিরাঊনের অনুসারীরা তো এভাবেই সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেছিল। তবে কি এটা ফিরাউনী নির্যাতনেরই নব সংস্কার?

শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের কথা বললেই পেটপুঁজারী আলেম ও রাষ্ট্রীয় নেতারা মিথ্যা অপবাদ আরোপ ও প্রপাগান্ডা করতে থাকে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা তো বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নেওয়া উচিত। কারণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে যত মত ও পথ রয়েছে তার সবই বাতিল পথ। ফিরাউন, নমরূদ, আবু জাহল ও আবু লাহাবের পথ। ক্ষমতা ও সংখ্যাধিক্যের কারণে কি ত্বাগূতের পথই ভাল? এ ভালটা কি চিরদিন অটুট থাকবে? ফিরাউন ও তার অনুসারীরা কি আজও পৃথিবীতে বেঁচে আছে? জনগণের যে তন্ত্রমন্ত্র একদিন ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত করে, সেই জনগণ যে পুনরায় ক্ষমতার আসন থেকে নামিয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারে, তা অনুভব না করা ক্ষমতাশীনদের বোকামীর পরিচয়ই বটে। কেননা প্রায় তিন কোটি জনতা সমন্বিত একটি বিশাল জামা'আতের ব্যাপারে জঘন্য মিথ্যাচার করা হয়েছে। চালানো হয়েছে যুলম-নির্যাতন ও মারাত্মক হয়রানী। ঘর ছাড়া করা হয়েছে অনেককে। ইয়াতীম করা হয়েছে কাউকে। সর্বোপরি মিথ্যা মামলা দিয়ে এখনো নেতৃবৃন্দকে আটকে রাখা হয়েছে। অতএব সময় থাকতেই সাবধান!

বাকস্বাধীনতা হরণকারী ও প্রবঞ্চক ফিরাউন ও তার দলবলের পরিণতি জাহান্নাম। ইতিহাসের পাতায় তারা ইতর, অভদ্র এবং শয়তানের দোসর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। অনুরূপ বর্তমানে যারা বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পন্থীদের মানসম্মান ক্ষুণ্ন করছে, বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করতে চাইছে, তাদের পরিণতির ব্যাপারে বোধ করি আর বলার প্রয়োজন নেই?

আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, এদেশের কোন ইসলামী দল কিছু মুখরোচক 'শ্লোগান' কাজে লাগিয়ে চাঁদে যাওয়ার মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু ক্বিয়ামত অবধি তাদের এ মনের বাসনা পূর্ণ হবে না। কারণ ধর্মের নাম করে তারা সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে। যারা মুখে ইসলামের কথা বলে, কিন্তু সারাটি জীবন চলে মানুষের মনগড়া ফিক্বহের আইন অনুসারে, তাদের পক্ষে কি করে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন ও হাদীছের আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব? এটা ভেবে দেখার বিষয় বৈ কি! অন্যদিকে যেখানেই তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসার দেখতে পায়- সেখানেই সুকৌশলে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে নির্ভেজাল 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র গতিরোধ করে। কারণ তাদের ধারণা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আন্দোলন চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ভোট ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলিম কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে ভালবেসে তার উপর নিঃশর্ত আমলে যখন আগ্রহী হয়ে উঠছে, তখন তারা হতাশ হয়ে মিথ্যা অপবাদের কালিমা লেপনের অপপ্রয়াস চালিয়ে নির্ভেজাল এ আন্দোলনের অগ্রগতিকে নস্যাত করতে চাইছে। কিন্তু হক্বপন্থী এ আন্দোলন কি থেমে আছে বা ভবিষ্যতে থেমে থাকবে? পৃথিবীর ইতিহাস তা প্রমাণ করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দলে ঘাঁপটি মেরে থাকা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই এর অনুসারীরা যেমন অতীতে ছিল, তেমনি বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ খাঁটি ঈমানদারগণের চোখের সামনে এবং মনের আয়নায় অবশ্যই ধরা পড়বে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যেদিন একজন সাধারণ মানুষও আর অন্ধ তাক্বলীদ ও ফিরক্বাবন্দীর বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে চাইবে না। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মুসলিম কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সার্বভৌমত্বের কথাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করবে।

সুধী পাঠক! আজ থেকে ২৫/৩০ বছর আগের কথা ভেবে দেখুন আর বর্তমান পীর-মুরীদী ব্যবসার দিকে লক্ষ্য

করুন! বিনা পুঁজির এ ব্যবসা আজ শিকায় উঠতে শুরু করেছে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন ফিরক্বাপন্থীদের সম্বিত ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। কতদিন আর সাধারণ মানুষকে অন্ধ তাক্বলীদের নয়ছয় বুঝ দিয়ে প্রতারণা করা যাবে? তাদের আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকলেও দেশের আলেম-ওলামার নিকট থেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সঠিক বিষয় জেনে নিতে পারবে। কেউ যাতে ভুল বুঝ দিতে না পারে সেজন্য আলেমদের নিকট থেকে নির্ভরযোগ্য ও সুস্পষ্ট দলীল সহ জেনে নিবেন *(নাহল ৪৩-৪৪)*। আর এখানেই হক্বপন্থী দাঈদের ব্যাপক সফলতা। যার ফলে হক্ব বা সত্য বিষয় বেরিয়ে আসবে। তখন শুরু হবে হক্ব ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব, শুরু হবে অন্ধ তাক্বলীদকারী ও তাক্বলীদ শিক্ষা দানকারীর মাঝে ঘোরতর টানা-হেঁচড়া। তখন কোন ব্যক্তির রচিত আইনের ঝাঁড়ফুক দিয়ে আর ঐ প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে থামিয়ে রাখা যাবে না।

এভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃস্বার্থ ভালবাসা যখনই কোন মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হবে তখন সে কখনই মাযহাবী অন্ধগোঁড়ামীতে আবদ্ধ থাকতে চাইবে না।

উল্লেখ্য যে, অন্ধ তাক্বলীদের অনুসারী শিক্ষক, গুরুজনরা সর্বপ্রথম ছাত্রদের কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পক্ষে কথা বলার অধিকার হরণ করে নেন। তারা বলেন, কুরআন ও হাদীছের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে আমল করা যাবে না, কুরআন-হাদীছ বুঝা কি এতই সহজ? কেউ বলেন, কোনরূপ প্রশ্ন করা যাবে না, আগের ইমাম বা মুরুব্বীগণ কি না বুঝেই আমল করেছেন?

প্রিয় পাঠক! এসব কি কুরআন ও হাদীছের অধিকার হরণ করা নয়? আমরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের অধিকার, রয়েছে একজন মুসলিম হিসাবে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় বিধান পালনের অধিকার। তবে আমরা কেন পারব না, সত্য ও ন্যায়ের একমাত্র অবলম্বন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে স্বাধীনভাবে মানতে ও প্রচার করতে?

অতএব আমরা মনে প্রাণে কামনা করি এদেশে কিতাব ও সুন্নাতের অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। মুসলমানদের বাকস্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকুক এবং দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান আল্লাহ প্রেরিত অহির বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। সেই সাথে নিষ্কৃতি পাক সকল ধরনের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে এবং মুক্তি পাক মযলূম নেতৃবৃন্দ ও নির্যাতিত মানবতা। আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত হেফাযতকারী।।

যেভাবে সমাজে নষ্টামি ছড়ায়

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

দেশে মসজিদ-মাদরাসা দৈনন্দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু সমাজ থেকে নষ্টামি দূরীভূত হচ্ছে না, বরং দিনদিন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা বলে থাকেন যে, মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে বলেই নষ্টামি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এমনতো হবার কথা নয়। কারণ মানুষ যদি ধর্মের মূলনীতির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে, তাহ'লে তাদের দ্বারা কোন অবিচার-ব্যভিচার প্রসারিত হবার কথা নয়। তবুও কেন হচ্ছে, তা কি আমরা কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখেছি? অনেকে বলে থাকেন বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী দেশ কিন্তু আসলে কি তাই? বস্তুত যারা মৌলবাদ বলে অপরকে দোষারোপ করে তারাই তা বুঝে কি-না সন্দেহ।

আমাদের দেশের সংবিধানের শীর্ষে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' যুক্ত রয়েছে। আরো আছে ঈমান-ইনছাফের কথা। এছাড়াও রয়েছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। আবার ইসলামী দল এখন রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার। এতদ্সত্ত্বেও রাষ্ট্রে, সমাজে, ব্যক্তিতে কতটা ইসলামী আখলাক বিদ্যমান রয়েছে? প্রায় শূন্যের কোঠায় বলা যায়। 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' এই ট্রেডমার্কের পরে সিগারেটের আমদানী এবং ব্যবহার কি এতটুকুও কমেছে? বরং বেড়েই চলছে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার পরও সমাজে ইসলাম বিরোধিতাও এখন চরম সীমায়। এটা প্রমাণসিদ্ধ।

খ্রীষ্টান বৃটিশ শাসনামল থেকে পাকিস্তানী আমল পর্যন্ত মাদরাসায় নারী-পুরুষে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। এখন তা হয়েছে। অথচ বেগানা মহিলার সঙ্গে একত্রে বসা, কথা বলা, চলাফেরা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ, বেপর্দা নারীদের কোন পুরুষ শিক্ষক কর্তৃক পাঠদান করাও নাজায়েয। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন মাদরাসায় ছাত্রীরা পর্দা প্রথা মেনে চলে না। মাদরাসার মাওলানা শিক্ষকগণ এ অবস্থাতেই পাঠদান করতে বাধ্য হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে কোন কোন শিক্ষক বলেন, কড়াকড়ি করলে যদি মেয়েরা মাদরাসায় না আসে, তাহ'লে মাদরাসা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আবার কোথাও কোথাও এমনও দেখা গেছে যে, মাদরাসার ছেলেরা সুন্নাতী লেবাস ছাড়াই মাদরাসায় আসে। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লেও উত্তর একই। মাদরাসার স্বার্থকেই বড় করে দেখা হচ্ছে। ঐ সিগারেটের মতই, ক্ষতিকর হিসাবে উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করে দিলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ক্ষতির বিষয়টা প্রচার করে উৎপাদন ও বিক্রয় বহাল রাখাই হিতকর।

* *সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*

অবশ্য একটি নীতিবাক্য আছে- 'দুষ্ট এঁড়ের চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল'। কিন্তু আমরা তা মানছি ক'জনে? তাহ'লে আমাদের দূরাবস্থা ঠেকায় কে?

মাদরাসায় যে হারে ছাত্র বেড়েছে সে হারে হকপন্থী যোগ্য আলেম বাড়ছে কি? বর্তমানে যেভাবে মাদরাসাগুলোতে কো-এডুকেশন চলছে এবং ইসলামী আদর্শের অবমূল্যায়ন হচ্ছে, তাতে যদি কিছু কিছু দাড়ি কামানো শার্ট-প্যান্ট-টাই পরা সূদখোর-ঘুষখোর এবং টেলিভিশনে নাটক দেখা মাওলানা দেখা যায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আবার দেখা যায়, মসজিদ বাড়লেও মুছল্লীর অভাব হয় না। অনেকে ছালাত পড়ছে ঠিকই কিন্তু তাদের আখলাকের পরিবর্তন দেখা যায় না। এরকম আজকাল গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত থেকে শুরু করে অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদেরকেও ছালাতের জামা'আতে শামিল হ'তে দেখা যায়। মনে হয় যেন মানুষের ঈমান মযবূত হচ্ছে। কিন্তু আসলে কি তাই?

তাই যদি হবে, তাহ'লে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেও কেন সূদ খাওয়া? ঘুষের টাকায় কেন ছিয়ামের মত মহান ইবাদতের সাহারী ইফতার করা? ছালাত ছিয়ামে অভ্যস্ত হয়েও কেন অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থে কেনা খাদ্য নিষ্পাপ শিশু সন্তানের মুখে তুলে দেওয়া? আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যা ফরয করেছেন, তা অবশ্যই পালনীয়। আবার আল্লাহ্র নির্দেশ রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অনুসরণ করার। তাঁর সুন্নাত অনুসরণে আল্লাহ খুশি হন। যার উপরে আল্লাহ খুশি, তার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত পাওয়ার আশা আছে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত যার নছীবে নেই, আখেরাতে তার পরিত্রাণের আশা নেই। মুসলমান মাত্রই জানা আছে, যারা বিধর্মীদের অনুসরণ-অনুকরণ করবে, তাদের হাশর হবে সেই ধর্মের লোকদের সঙ্গেই। আমরা কি সবাই ছালাতে মুসলমানের জাতীয় পোষাক অর্থাৎ সুন্নাতী লেবাস ব্যবহার করতে পারি না? আমাদের অসুবিধাটা কোথায়? কেন তা আমাদের কাছে গুরুত্ব পায় না?

আমাদের দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়ছার এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান এই দুই সহোদর এক মাওলানার সন্তান, যিনি মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। শহীদুল্লাহ কায়ছারের মেয়ে শমী কায়ছার টেলিভিশন নাটকের অভিনেত্রী। তার বিয়ে হয়েছিল ভারতীয় হিন্দু অর্ণব ব্যানার্জির সঙ্গে। আর জহির রায়হান ছিলেন সিনেমা পরিচালক। তার দুই স্ত্রীই সিনেমার নায়িকা। তাদের একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবীতে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভের পরেও কেন ফেরদৌসী মজুমদার নাটকের অভিনেত্রী এবং হিন্দুর ঘরনী? অভিভাবকের অবহেলায় তারা অধঃপাতে গিয়েছেন, তা বলাই যেতে পারে। আর ইলম অনুযায়ী আমল না করলে যে আখলাকের পরিবর্তন হয় না এটাও স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং আমল বিহীন ইলম কি কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারে?

আমাদের দেশের একদল কথিত প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী ইসলামী আমল-আখলাক এবং অনুশাসন পসন্দ করেন না। এসব তাদের কাছে মৌলবাদ-ধর্মোন্মাদনা, অহিতকর। তবে খ্রীষ্টানী-হিন্দুয়ানী মৌলবাদে তাদের আপত্তি নেই। কেননা সেসব তাদের আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। আর মজাতো ঐখানেই। মুসলমানদের জন্য নাচ-গান-বাজনা হারাম ও পাপ। আর হিন্দু-খ্রীষ্টানদের তাতেই উপাসনা। মদকে হারাম করা হয়েছে। হিন্দুরাতো তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান দূর্গা-কালীপূজায় মদ-গাঁজা খেয়ে মাতাল হয়ে লাফায়। আর প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিতে যত আপদ ইসলামে। খ্রীষ্টানদের কেবল পূজা-অর্চনা নয়, তাদের পানীয় বলতেই মদ। আমরা যেমন খাদ্যের সঙ্গে পানি খাই, তারা তেমনি মদ খায়। তাহ'লে বলুন, যারা প্রগতির কারণে ইসলামী বিধিবিধান পসন্দ করে না, মেনে চলে না; বরং হিন্দুয়ানী-খ্রীষ্টানী রীতিনীতি অনুসরণ করে, তারা কি মুসলমান? কখনো নয়। মুসলমানের ঘরে জন্মেছে বলে যদি মুসলমান বলতেই হয়, তাহ'লে শুধু গরু খেকো মুসলমান বলা যেতে পারে।

আমি মনে করি যার যা পসন্দ তাকে তার মধ্যেই পুরোপুরি প্রবিষ্ট হওয়া উচিত। হিন্দুয়ানী পসন্দ করে মুসলমানের খাতায় নাম লিখিয়ে কী লাভ। এসব গরু খেকো নামধারী মুসলমানদেরকে নিজেদের সমাজে শামিল রেখে সঠিক মুসলমানদের লোকসান ছাড়া কোন লাভ নেই। ঐ যে বলেছি, দুষ্ট এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল, এটাই সঠিক। আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা যে ক'জন থাকে তাদের দ্বারাই ইসলামের কাজ চলতে পারে, ইসলামী সমাজও তাদের দ্বারাই চলবে। সংকর দিয়ে ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার হয় না। তারা নামে, লেবাসে, আচার-আচরণে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে আছে। শুধু অন্য ধর্মে যেতে পারছে না, তারা নিচ্ছে না বলে। কারণ তারাও জানে যে, যাদের মধ্যে মুসলমানের রক্তের ছিটেফোঁটাও আছে, তাদেরকে নিজেদের সমাজে ঠাঁই দেওয়া ঠিক নয়। মুসলমানরা অবশ্য হিন্দু-খ্রীষ্টান-ইহুদীকেও ধর্ম-সমাজে ঠাঁই দিতে পারে যদি সে শুদ্ধ হয়ে এখানে আসে। কিন্তু স্বগোত্রীয় হ'লেও মুরতাদের ঠাঁই ইসলামী সমাজে নেই। এরা ভাবতে পারে যে, জন্মসূত্রে তারা মুসলমান। আসলে তারা মুসলমান নয়। যারা মুসলমানের ধর্মীয় আচার-আচরণ মানে না, তারা কিসের মুসলমান? শুধু মুখে স্বীকার করলে তো হবে না আচার-আচরণেও প্রকাশ করতে হবে। অবশ্য প্রগতিশীলদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা বলে, পরকাল বলে কিছু নেই, মৃত্যুর পরে কিছু হবে না, বিচার, বেহেশত-দোযখ শুধু ভয় দেখানোর জন্য, এরা নির্ভেজাল

নাস্তিক। নাস্তিকের আবার ধর্ম কি? এদের বিবেচনায় ব্যভিচার বলে কিছু নেই। যেমন তসলিমা নাসরিনের বক্তব্য- শরীর চাইলেই শরীরের চাহিদা মেটানোতে কোন দোষ নেই। এমন হ'লে নারীদের পর্দার আবশ্যকতাই বা কি? আর অশ্লীলতাইবা কি?

ইসলামে পর্দা প্রথা কেন? সেকি নারীদের উপর যুলুম করবার জন্য? প্রগতিবাদীরা তা-ই মনে করে। মূলতঃ সংযম অবলম্বনের জন্য পর্দা আবশ্যক । বেপর্দা নারী দেখে পুরুষদের মনে কামোত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আবার পুরুষদের সঙ্গে নারীর মেলামেশা অবাধ হ'লে, নারীও যৌনকাতর হয়ে যেতে পারে। এজন্য কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আপনি মুমিন পুরুষগণকে বলুন! তারা যেন আপন দৃষ্টি সংযত ও নত করে চলে এবং আপন লজ্জাস্থান সংযত রাখে' *(নূর ৩০)*। আর নারীদের জন্য বলা হয়েছে 'মুমিনা নারীদেরকে বলুন, 'তারা যেন তাদের আপন দৃষ্টি সংযত রাখে, আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করে চলে, প্রকাশ না করে তাদের বেশভূষা ও অলংকার। ততটুকু ভিন্ন যতটুকু সাধারণতঃ এমনিতে প্রকাশ পায়। আর আপন চাদর তার আপন গলা ও বুকের উপর জড়িয়ে দেয় এবং প্রকাশ না করে তাদের সাজ-পোষাক' *(নূর ৩১)*।

খামাখা উল্টো বুঝতে না চাইলে এটা মানতেই হবে যে, পর্দা একান্ত যরূরী। এটা নৈতিক এবং দৈহিক উভয় দিক থেকে মঙ্গলজনক ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বেপর্দার বেলেল্লাপনা সমাজে ব্যভিচার আমদানী করে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বেপরোয়া যৌনতা সিফলিস, গনোরিয়া, এইড্স রোগের কারণ, তা গবেষক চিকিৎসকরাই বলেন। তাহ'লে পর্দাহীনতাকে মন্দ না বলে উপায় কি? সেটা যে সমাজে অমঙ্গল বয়ে আনে, তা অস্বীকার করা যায় না। এমতাবস্থায় নারীর শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী কি বন্ধ করে দিতে হবে? না, তা বলছি না। নারীকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নারীরও উপার্জন করবার আবশ্যকতা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বক্তব্য একটাই যে, নারীরা যা কিছু করুক, পর্দা রক্ষা করেই করবে। তাহ'লে নারীর সুরক্ষা হ'তে পারে। আর পুরুষেরাও পাপ ও পতন থেকে রেহাই পাবে। তারপরেও যদি কিছু অঘটন ঘটে, তা দুর্দৈব এবং তার সংখ্যা অবশ্য অল্প হ'তে বাধ্য।

দেশের প্রায় অর্ধেক লোক সংখ্যা যখন নারী, তখন নারীদের জন্য পৃথক স্কুল-কলেজ-মাদরাসা চালু করা যেতেই পারে। স্কুল-কলেজ-মাদরাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিযুক্তির বিধান না করে ৩০% মহিলা স্কুল-কলেজ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় না কেন? তাহ'লে তো মহিলাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই শিক্ষা লাভের সুযোগ মিলে যায়। আবার এও অহরহ শোনা যায় যে, পুরুষদের সঙ্গে অফিস-আদালতে, কল-কারখানায় কাজ করতে গিয়ে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বিভিন্নভাবে তারা পুরুষ কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছে। পুরুষেরা নারী নিগৃহ না করলেই পারে, এ কথা না বলে নারীদের জন্য কিছু কিছু পৃথক কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায় না কি? মনে হয়, তা একেবারেই অসম্ভব নয়। ইচ্ছে থাকলে তেমনটি হ'তেই পারে। তবে সব ধরনের কাজই যে নারীদের করতেই হবে, এমন কথা কি? দেহমনে নারী-পুরুষে কিছুটা তফাৎ রয়েছে। এটা অস্বীকার করা যায় না। সেহেতু তাদের কর্মক্ষেত্রেও কিছুটা ভিন্নতা কি থাকতে পারে না? তাছাড়া ইসলাম ধর্ম নারীদের অবাধ বিচরণ নিষিদ্ধ করেছে। মুসলমানের পক্ষে ইসলামী বিধানও লংঘনীয় নয়। সেক্ষেত্রে মুসলিম রমণীদের জন্য সব ধরনের কাজে অংশ গ্রহণ, সকল পথে বিচরণ উচিত কি-না তা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। আর যদি বুঝেও না বোঝার ভান করা হয়, তাহ'লে আর কী বলার আছে!

আসলে আমরা নিজেদের নাক নিজেরা কামড়াচ্ছি। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে, সমাজের লোকদেরকে সঠিক পথে চালাতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের মুসলিম দেশে আমরাই মুসলমানদের ধর্মবিরোধী বিধিবিধান চালু করে দিয়েছি। আমরা স্বধর্ম থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের দেশে, সমাজে নষ্টামি বাড়বে না কেন? তাই বলব, আমাদের 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' যেন শুধুই কাগজে না হয়, বরং কিছুটা হ'লেও যেন এর বাস্তবায়ন হয়। তবেই আমাদের সমাজ নষ্টামিমুক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস।।

হাফেয ইমাম আবশ্যক

কুষ্টিয়া যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও হেফযখানার জন্য একজন দক্ষ ও যোগ্য হাফেয ও ইমাম আবশ্যক। প্রার্থীকে ছহীহ আক্বীদাহ ও জুম'আর খুৎবা প্রদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে হবে। বেতন-ভাতাদি আলোচনা সাপেক্ষ। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করবেন। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১১১৬৭৭১৭

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসানের সময়ে (১৮৩২-৯০খৃঃ) ভারতবর্ষে হাদীছের রেওয়াজ ছিল খুব কম। রায়, ক্বিয়াস ও মাযহাবী ফিক্বহের রেওয়াজ ছিল বেশী। রাজ দরবার হ'তে পর্ণকুটির পর্যন্ত সর্বত্র ছিল একই অবস্থা। এমনকি ভারতগুরু শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১১৫৯-১২৩৯হিঃ/১৭৪৬-১৮২৪খৃঃ) দরসগাহে মাত্র দু'খানা বুখারী শরীফ ছিল। যার বিভিন্ন পারা খণ্ড খণ্ড করে ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হ'ত এবং পাঠ শেষে ফিরিয়ে নেয়া হ'ত।[৬৫]

সর্বত্র মাযহাবী ফিক্বহের রেওয়াজ থাকার কারণে মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসারী মুক্বাল্লিদ হিসাবে পরিগণিত হন। ফলে মাযহাব বিরোধী কোন বক্তব্য তা যতই ছহীহ দলীলভিত্তিক হৌক না কেন, তা মেনে নিতে সমাজ প্রস্তুত ছিল না। তাই সেই সময়কার মুসলিম সমাজকে এক কথায় 'তাক্বলীদী সমাজ' বলা চলে।[৬৬]

সে সময় মুসলিম সমাজ শিরক ও বিদ'আতের তিমির অমানিশায় হাবুডুবু খাচ্ছিল। স্বীয় আত্মজীবনীতে নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান লিখেছেন, 'হিন্দুস্থানী মুসলমানদের মধ্যে শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন ছিল। আর যারা সুন্নী ছিল তারা ছিল গোরপূজারী ও পীরপূজারী'।[৬৭]

এমত পরিস্থিতিতে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান কুরআন-সুন্নাহ্র স্বচ্ছ আলোর ঝলকানিতে মুসলিম সমাজকে আলোকিত করা এবং জনগণের নাগালের মধ্যে সুন্নাহকে নিয়ে আসার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে গ্রন্থ রচনা এবং প্রচার-প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বহু দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য দ্বীনী গ্রন্থাবলী তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মিসর, বৈরুত ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রেস হ'তে ছাপিয়ে এনে বিপুলহারে বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী সমূহে এবং ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ফলে আরব-আজমের এমন কোন লাইব্রেরী ছিল না যেখানে নওয়াব ছাহেবের রচিত বা প্রকাশিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যেত না।[৬৮] স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'আমার গ্রন্থাবলী এডেন, ইয়েমেন, ছান'আ, যাবীদ, বায়তুল ফাকীহ, হাদীদাহ, বাগদাদ, হারামাইন শরীফাইন, মিসর, বায়তুল মুক্বাদ্দাস, দামেশক, বৈরুত, ফারান, কনষ্টান্টিনোপল এবং পারস্য পর্যন্ত পৌঁছেছে'।[৬৯]

স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি 'দ্বীনী কুতুব কী ইশা'আত' (ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর প্রচার) শিরোনামে বলেন, 'আমার অধিকাংশ সম্পদ কিতাব ও সুন্নাতের ইলমসমূহ প্রচারের পিছনে ব্যয় হয়ে যায়। আমি প্রতিটি গ্রন্থ ১০০০ কপি ছেপে এনে নিকট ও দূরের সকল দেশে বিলি করেছি। কারো কাছ থেকে কখনও কোন কিতাবের মূল্য নেইনি'।[৭০] এক্ষেত্রে রাণী শাহজাহান বেগমের অবদান স্বীকার করে তিনি বলেন, 'রাণীর গর্ভে আমার কোন সন্তান জন্মেনি। তবে গ্রন্থ প্রকাশনা ও প্রচারণার মাধ্যমে- যা সৌভাগ্যের দিক দিয়ে রক্তের সন্তানের চেয়েও অধিক, সেই সব ভাবগত সন্তানের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। যা কেবলমাত্র উচ্চমর্যাদা ও অবসর পাওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। যদি রাণীর সাথে আমার বিবাহ না হ'ত, তাহ'লে বাস্তবিক পক্ষে ঐসব দ্বীনী কিতাবসমূহের প্রকাশনা ও প্রচারের কোন সুযোগ আমার হ'ত না'।[৭১]

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের যে সমস্ত কিতাব বহু অর্থ ব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি ফ্রি বিতরণ করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হ'লঃ ১. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী কৃত বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য 'ফাতহুল বারী' ২. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩. ইমাম শাওকানীর 'নায়লুল আওত্বার' প্রভৃতি।[৭২]

উল্লেখ্য, নওয়াব ছাহেবের প্রচেষ্টায়ই ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম 'ফাতহুল বারী' আনা হয়। ৬০০ টাকার বিনিময়ে তিনি হাদীদাহ (ইয়েমেন) থেকে এটি ক্রয় করে পঞ্চাশ হাযার টাকা ব্যয় করে মিসরের 'বুলাক প্রেস' থেকে হাযার হাযার কপি ছাপিয়ে এনে ফ্রি বিতরণ করেন। পরবর্তীতে এই কপিকে সামনে রেখেই বিভিন্ন প্রেস 'ফাতহুল বারী' ছাপে।[৭৩]

তাঁর এই ব্যাপক প্রকাশনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং এর মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন জোরদার হয়। আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন,

وَحَرَكَتُهُ النَّشْرِيَّةِ لِلْعُلُوْمِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ تُعْتَبَرُ مِنْ أَهَـــمِّ الْخِدْمَاتِ فِيْ عَصْرِهِ، وَهٰذِهِ الْخِدْمَاتُ كَانَ لَهَا أَثَرٌ بَارِزٌ فِي

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৫. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৩-৪৪।
৬৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ৩৫১।
৬৭. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ২০১।
৬৮. ইমাম খান নওশাহরাবী, হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কি ইলমী খিদমাত (লাহোরঃ মাকতাবায়ে নাযীরিয়াহ, ১৯৯৩), পৃঃ ২৭-২৮; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৩।
৬৯. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৭২।
৭০. ঐ, পৃঃ ৭৫।
৭১. ঐ, পৃঃ ১৬২-৬৩।
৭২. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৩; হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ২৮; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৯৬; ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৭০।
৭৩. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৭০; হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ২৮।

تَنْشِيْطِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحَقَّةِ وَإِيْقَاظِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ سَبَاتِهِمُ الْعَمِيْقِ وَرُجُوْعِهِمْ إِلَى الْمَصْدَرِيْنِ الصَّافِيَيْنِ لِلْإِسْلَامِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ-

'ইসলামী ও আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশনা আন্দোলন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ খিদমত হিসাবে গণ্য করা হয়। সঠিক ইসলামী দাওয়াতের কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি, মুসলমানদেরকে তাদের গভীর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলা এবং ইসলামের দু'টি স্বচ্ছ উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করার ক্ষেত্রে এই খিদমতের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে'।[৭৪]

এর ঢেউ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বকেও আন্দোলিত করে। আল্লামা মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী বলেন,

وَهِيَ نَهْضَةٌ عَظِيْمَةٌ أَثَرَتْ عَلَى بَاقِي الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَاقْتَدَى بِهَا غَالِبُ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِيْ طَبْعِ كُتُبِ الْحَدِيْثِ وَالتَّفْسِيْرِ-

'এটি একটি বড় নবজাগরণ, যা অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে প্রভাব বিস্তার করে। হাদীছ ও তাফসীরের গ্রন্থাবলী ছাপানোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলিম দেশ এই নবজাগরণের পদাংক অনুসরণ করে'।[৭৫]

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান হাদীছের প্রচার-প্রসার এবং হাদীছ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কুরআনের ন্যায় হাদীছ মুখস্থ করার জন্যও আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি ছহীহ বুখারী মুখস্থ করার জন্য এক হাযার টাকা এবং বুলূগুল মারাম মুখস্থ করার জন্য একশত টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দু'জনের নাম জানা যায়। একজন হাফেয মৌলবী হাকীম আব্দুল ওয়াহ্হাব নাবীনা দেহলভী (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খৃঃ) এবং অন্যজন হ'লেন মৌলবী আব্দুত তাওয়াব গযনবী আলীগড়ী (মৃঃ ১৩৬৬ হিঃ/১৯৪৭ খৃঃ)। শেষোক্তজনের জন্য ঘোষিত পুরস্কার ছাড়াও মাসিক ৩০ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়।[৭৬]

তাছাড়া নওয়াব ছাহেব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু আলেমকে গ্রন্থ রচনা এবং দাওয়াতী কাজের জন্য নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য মাসোহারা নির্ধারণ করেন। তিনি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামান ও বদীউয্যামান-এর ভাতা নির্ধারণ করে উভয় ভ্রাতাকে কুতুবে সিত্তাহর উর্দূ অনুবাদের দায়িত্ব দেন। অতঃপর উহার প্রকাশ ও প্রচারের কাজে বিপুল অর্থ ব্যয় করে ইলমে হাদীছের চর্চা ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেন।[৭৭]

মাদরাসা প্রতিষ্ঠাঃ

তিনি ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য ৪টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি হচ্ছে- ১. মাদরাসা বিলক্বীসিয়াহ। এখানে রাজ্যের ইয়াতীম ও ছিন্নমূল ছেলে-মেয়েরা প্রতিপালিত হ'ত। ২. মাদরাসা সুলাইমানিয়াহ্। এখানে মৌলবী, আলেম, ফাযেল, মুফতী, মুনশী ও কাবেল মোট ৬টি স্তরের ডিগ্রী প্রদান করা হ'ত। সুন্দর হস্তলিপি, প্রবন্ধ লিখন, আইন এবং অংক শাস্ত্রে দক্ষ ছাত্রদেরকে শেষোক্ত ডিগ্রী প্রদান করা হ'ত। হস্তলিপি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে মাসিক ১০-১৫ টাকা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদেরকে ১৫-৩০ টাকা এবং মুনশী ও কাবেল ডিগ্রীধারীদেরকে ৩০-৫০ টাকা মাসোহারা প্রদান করা হ'ত। ৩. মাদরাসা জাহাঙ্গীরী ও ৪. মাদরাসা ছিদ্দীক্বী।[৭৮]

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাঃ

তিনি কয়েকটি লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন কুতুবখানা ফায়যে আম, কুতুবখানা মাদরাসা জাহাঙ্গীরী, কুতুবখানা সরকারী ও কুতুবখানা ওয়ালাজাহী।[৭৯] শেষোক্ত লাইব্রেরীটি বহু দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রন্থাবলীতে ঠাঁসা একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিল। এতে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, হাফেয যাহাবী, ইমাম শা'রানী, হাফেয মুনযেরী, সাফারীনী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনে রজব হাম্বলী, ইবনুল জাওযী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম ছান'আনী, ইমাম শাওকানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের গ্রন্থ মওজুদ ছিল। এসব গ্রন্থের মধ্যে একশ', দু'শ, তিনশ', চারশ' এমনকি ছয়, সাত ও আটশ' বছরের পুরাতন পাণ্ডুলিপিও ছিল। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এসব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ মক্কা-মদীনা, ইয়েমেন, বহরা প্রভৃতি স্থান থেকে সংগ্রহ করেন।[৮০]

এ লাইব্রেরীটি মৃত্যুর পূর্বে তিনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তাঁর পুত্র নওয়াব আলী হাসান খান নিজের অংশের গ্রন্থগুলি 'নাদওয়াতুল ওলামা' লক্ষ্ণৌ-এর জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। কিছু কিতাব ভূপালের 'নূরমহলে' ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে আছে।[৮১]

---

৭৪. *আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদু আহলিলহাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খৃঃ), পৃঃ ২১।*

৭৫. *মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী, নামূজায মিনাল আ'মাল আল-খায়রিইয়াহ (মিসরঃ ইদারাতুত তিবা'আহ আল-মুনীরিইয়াহ, তাবি), পৃঃ ৪৬৮।*

৭৬. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৭; হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কি ইলমী খিদমাত, পৃঃ ২৭; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৯৯।*

৭৭. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৯৮; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯৮।*

৭৮. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৬।*

৭৯. *ঐ, পৃঃ ২৪৬।*

৮০. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৭০-৭১, ১২০।*

৮১. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৬-৪৭, ২৬১; ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১৬০-৬১।*

জিহাদ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ

নওয়াব ছাহেবের পিতা সাইয়িদ আওলাদ হাসান কন্নৌজী সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়'আত করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নওয়াব ছাহেবের বাড়ীঘর ধূলিস্যাৎ করা হয়। তাছাড়া মা-বোন সকলের দায়-দায়িত্ব ছিল তাঁর উপরে। ফলে বাস্তুহারা নিঃস্ব এই বেকার যুবকের পক্ষে ঐ সময় বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। সর্বোপরি ছিল ব্যাপক ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়। সেকারণ তিনি লেখনী যুদ্ধের পথ বেছে নেন। তাঁর অধিকাংশ লেখনীতে জিহাদের প্রেরণা থাকত। তাঁর রচিত 'তারজুমানে ওয়াহ্হাবিইয়াহ্' 'ইকতিরাবুস সা'আহ' 'হেদায়াতুস সায়েল' 'মাজমূ'আ খুত্বাব' প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল জিহাদী অনুপ্রেরণায় ভরা। শেষোক্ত বইয়ে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর জ্বালাময়ী ভাষণ সংযোজিত হয়েছে। উক্ত কিতাবগুলি তিনি সারা ভারতে ফ্রি বিলি করেন। এইভাবে সমগ্র ভারতে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ও ইসলামী জোশ সৃষ্টি করেন।

কিন্তু নওয়াব ছাহেবের শত্রুরা কোনদিকে পেরে না উঠে অবশেষে তাঁকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করে ইংরেজদের হাত দিয়ে খতম করার পরিকল্পনা আঁটে এবং তাঁর সমস্ত জিহাদী বই ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করে। বিশেষ করে আল্লামা ইসমাঈল শহীদের খুৎবাটি ফ্রি বিলি করার বিষয়টিকে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে সরকারের কানভারি করা হয়। যেখানে বলা আছে 'যে ব্যক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করল না কিংবা জিহাদের সংকল্প করল না, সে ব্যক্তি মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হবে'।

পরিণাম যা হবার তাই হ'ল। বিরোধীদের ষড়যন্ত্র কার্যকর হ'ল। জীবনীকার নওয়াব আলী হাসান খানের ভাষায়, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশোধের তরবারি সঞ্চালিত হ'ল। দেহ হ'তে মস্তক ছিন্ন হ'তে আর বেশী দেরী ছিল না। কিন্তু মন্দ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিবেচনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদেরকে এই কঠিন পদক্ষেপ হ'তে বিরত করেন'। রাণীর খাতিরে নওয়াব ছাহেবকে হত্যা না করে ক্ষমতাহীন করাকেই তারা যুক্তিযুক্ত মনে করল এবং তাঁকে বরখাস্ত করে কর্ণেল ওয়ার্ডকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হ'ল।[৮২]

সংস্কারক ভূপালীঃ

শী'আ দাদা ও মুহাম্মাদী পিতার ঘরে লালিত-পালিত হয়ে আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান চরম বিদ'আত অধ্যুষিত ভূপাল শহরে দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের জীবনে অত্যন্ত কঠিন বিরোধী ও শত্রুতামূলক পরিবেশ অতিক্রম করেন। প্রচলিত মাযহাবী ইসলামের তিনি বিরোধিতা করেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাক্বলীদের বন্ধনমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণে ব্রতী হন ও লেখনী ধারণ করেন।[৮৩] লেখনীকে তিনি বেছে নেন সমাজ সংস্কারের মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, লেখনীর ব্যাপারে আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ নিজের উপকার সাধন করা যে, প্রত্যেক হুকুম ও মাসআলার ব্যাপারে হক-কে বাতিল হ'তে ছহীহকে যঈফ হ'তে বাছাই করা। একই সাথে দলীল থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলি রায়-এর ভিত্তিতে লিখিত বিষয়গুলি হ'তে পৃথক করা। এর দ্বারা আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এসব মুসলমানকে ফায়েদা পৌঁছানো, যারা কোন প্রকারের গোঁড়ামি ছাড়াই কেবল হক্ব-এর সন্ধানী এবং ছিরাতে মুস্তাকীম-এর উপরে চলতে আগ্রহী'।[৮৪]

তিনি ব্যাপক সামাজিক বিরোধিতার মধ্যেও ১৯টি বে-শরা রসম-রেওয়াজ উচ্ছেদ করেন এবং আরও ২৬টি অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল তাঁকে সে সময় দেয়নি। এতদ্ব্যতীত ১১টি কল্যাণ প্রথা তিনি চালু করেছিলেন।[৮৫] সাথে সাথে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা, পুস্তক-পুস্তিকার ব্যাপক প্রচার-প্রকাশনা ও বিতরণের মাধ্যমে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বে সংস্কার ও নবজাগরণের এক নবঅধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এ কারণেই আবু দাউদের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯হিঃ/১৮৫৭-১৯১১খৃঃ), মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০খৃঃ) প্রমুখ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম যথার্থভাবেই তাঁকে হিজরী 'চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ' বা যুগসংস্কারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। জনৈক কবি এ সম্পর্কে বলেন,

مُجَدِّدُ الْعِلْمِ فِىْ هَذَا الْأَوَانِ وَ مَنْ : قَدْ أَنْقَذَالنَّاسَ مِنْ بِدْعٍ وَإِشْرَاكِ

'তিনি (নওয়াব ছাহেব) এ যুগের ইল্মের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। যিনি মানুষদেরকে শিরক ও বিদ'আত থেকে বাঁচিয়েছেন'।[৮৬]

লেখনীঃ

আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ) ছিলেন কলমী জিহাদের এক নির্ভীক সেনানী। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবী, উর্দূ ও ফারসীতে সমানতালে লিখে গেছেন তিনি। মুসলিম জাহানের তিনিই একমাত্র মনীষী যিনি আরবী ভাষার প্রথম বর্ণ 'আলিফ' থেকে শেষ বর্ণ 'ইয়া' পর্যন্ত কমপক্ষে একখানা বই রচনা

৮২. *সাইয়িদ আবিদ আলী হুসাইনী, ভূপালঃ তাহরীকাতে আযাদী কে আয়েনা মেঁ (বুধওয়ারা, ভূপালঃ ভূপাল বুক হাউস, তাবি), পৃঃ ১৯১-৯৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৫৬-৫৭।*

৮৩. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৫১।*
৮৪. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৬৩।*
৮৫. *ঐ, পৃঃ ৩৮৫-৮৭।*
৮৬. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৩৫৪, ৩৫৬।*

করেছেন।[৮৭] তিনি ছোট-বড় সর্বমোট ২২২টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৮৮] তন্মধ্যে তাফসীর ও তাফসীরের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ৬টি, হাদীছ ও হাদীছের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থ ৩৩টি, আকাইদ ও মাসায়েল সম্পর্কিত ৩০টি, ফিক্বহ ও ফিক্বহ সম্পর্কিত ২৪টি, তাকলীদের প্রতিরোধ ও সুন্নাতের অনুসরণ সম্পর্কিত ১০টি, রাষ্ট্রনীতি ও শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ৬টি, ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক ২২টি, মানাকিব (মর্যাদা) বিষয়ক ১৩টি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক ২২টি, নৈতিকতা সংক্রান্ত ৩৮টি ও বিবিধ ১৮টি।[৮৯] এর মধ্যে আরবী ভাষায় ৫৬টি, ফারসী ভাষায় ৫০টি এবং উর্দূ ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।[৯০] তাঁর রচনাবলীর সংখ্যাধিক্যের কারণ সম্পর্কে তিনি স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন, 'যেদিন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন বা লিপিবদ্ধ করার সুযোগ হ'ত না, সেদিন আমি যেন অসুস্থ হয়ে পড়তাম। একারণেই সমকালীন ওলামায়ে কেরামের তুলনায় আমার রচনাবলীর সংখ্যা বেশী'।[৯১] নিম্নে তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'লঃ-

(১) **ফাতহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআনঃ** ৭ খণ্ডে একাধিকবার প্রকাশিত এটি আরবী ভাষায় রচিত একটি উঁচুমানের তাফসীর। কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক রচিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর আলোকে এ তাফসীরটি তিনি রচনা করেন। এটি যেন ইমাম শাওকানীর তাফসীর 'ফাতহুল ক্বাদীর'-এর নতুন রূপ। 'ফাতহুল ক্বাদীর' ছাড়াও তিনি তাফসীর ইবনে কাছীর ও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য তাফসীর থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন।[৯২] তিনি এই তাফসীরে সালাফে ছালেহীন বা পূর্বসূরীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআন মাজীদ বুঝানোর জন্য অত্যন্ত কার্যকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং গ্রহণযোগ্য প্রাচীন তাফসীর সমূহের সারমর্ম সংরক্ষণ করেছেন। এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর বলে বিবেচনা করা হয়। আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরামও এই তাফসীরখানি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন।[৯৩]

(২) **তারজুমানুল কুরআন বিলাতায়িফিল বায়ানঃ** উর্দূ ভাষায় রচিত এ তাফসীরটি ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত। অজ্ঞতা, তাক্বলীদ, মাযহাবী গোঁড়ামি এবং শিরক-বিদ'আতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভারতীয় মুসলিম সমাজে কুরআনের বাণী, মর্ম ও শিক্ষা পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জীবনের শেষ দিকে ১৩০২ হিজরীতে তিনি এ তাফসীরটি লিখা শুরু করেন। প্রথমতঃ ২৯ ও ৩০ পারার তাফসীর ১ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। এরপর সূরা ফাতিহা থেকে সূরা কাহ্ফ পর্যন্ত ৬ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরের তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ছাত্র ও আমৃত্যু খাদেম মাওলানা যুলফিকার আহমাদ ভূপালী সূরা মারয়াম থেকে সূরা তাহরীম পর্যন্ত অবশিষ্ট সূরার তাফসীর ৮ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। এভাবে মোট ১৫ খণ্ডে তাফসীরটি সমাপ্ত হয়।

উর্দূ ভাষায় এটিই প্রথম তাফসীর গ্রন্থ যেটিতে কুরআন মাজীদের মর্ম অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে যদিও শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী (রহঃ) কৃত উর্দূ তাফসীর 'মুওয়াযেহে কুরআন' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেটি এতটা বিস্তৃত ছিল না। নওয়াব ছাহেব স্বীয় তাফসীরে শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী কর্তৃক অনূদিত কুরআনের আয়াতের তরজমা সংযোজন করেন। তবে শতাব্দীর ব্যবধানে উর্দূ ভাষার বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে যুগের চাহিদা অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। এ তাফসীরে তিনি পূর্ববর্তী গ্রহণযোগ্য তাফসীর বিশেষ করে তাফসীর ইবনে কাছীর ও ইমাম শাওকানীর 'ফাতহুল কাদীর'-এর উপর বেশী নির্ভর করেছেন এবং ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনা পরিহার করেছেন। কুরআন মাজীদের ফিক্বহী মাসায়েল অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এটির ভাব-ভাষা অত্যন্ত সুন্দর ও যথার্থ। অতি সহজেই পাঠক তা বুঝতে সক্ষম হন। পাঠক এ তাফসীরটি অধ্যয়ন করতে করতে যতই সামনে অগ্রসর হন, ততই আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। লাহোরের 'আহমাদী প্রেস' থেকে এটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

(৩) **তাযকীরুল কুল বিতাফসীরিল ফাতিহা ওয়া আরবা' কুল (উর্দূ)ঃ** সূরা ফাতিহা, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাছ, সূরা নাস ও ফালাক্ব এই পাঁচটি সূরার তাফসীরগ্রন্থ এটি। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০। নওয়াব ছাহেবের জীবদ্দশায় ১৩০৭ হিজরীর পূর্বেই এটি প্রকাশিত হয়। তাছাড়া আগ্রার 'মুফীদে আম' প্রেস থেকেও প্রকাশিত হয়।

(৪) **নায়লুল মারাম মিন তাফসীরে আয়াতিল আহকাম (আরবী)ঃ** কুরআন মাজীদের আহকাম সংক্রান্ত ২৩৬টি আয়াতের অত্যন্ত চমৎকার তাফসীর। ১২৯২ হিজরীতে ভূপাল থেকে এবং ১৩৮২হিঃ/ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মিসরের 'মাদানী প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়।

(৫) **ফাছলুল খিত্বাব ফী ফাযলিল কিতাব (উর্দূ)ঃ** ফাযায়েলে কুরআন বিষয়ক এ গ্রন্থটি প্রথমে ভূপালে এবং পরবর্তীতে ১৩১৪ হিজরীতে দিল্লীর 'ফারূকী প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়।

---

৮৭. *আবূত তাইয়িব সাইয়িদ ছিদ্দীক্ব হাসান কন্নৌজী, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ (বেরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ৬-৯।*

৮৮. *আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদভী, আল-মুসলিমূনা ফিল-হিন্দ (লক্ষ্ণৌঃ নাদওয়াতুল ওলামা, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৩৮; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৫১-২৬১; হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ২৮।*

৮৯. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৫১-৬১।*

৯০. *আল-মুসলিমূনা ফিল-হিন্দ, পৃঃ ৩৮; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯৮।*

৯১. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১৪৬।*

৯২. *জুহূদু আহলিলহাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ২৩; ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৩৪৬-৪৭; হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ৩৪।*

৯৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯৮-৯৯।*

(৬) **একসীর ফী উছূলিত তাফসীর (ফারসী)ঃ** উছূলে তাফসীরের উপর একটি উৎকৃষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে তিনি প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থ ও মুফাস্সিরগণ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। সাইয়িদ নূরুল হাসান হুসাইনী এটিকে আরবীতে অনুবাদ করেছেন। আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে লেখক গ্রন্থটিকে বিন্যস্ত করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের কোন আলেমের এতদসংক্রান্ত এটিই প্রথম গ্রন্থ। ১২৯০ হিজরীতে কানপুরের 'নিযামী প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়।

(৭) **ইফাদাতুশ শুয়ূখ বিমিকদারিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ (ফারসী)ঃ** এ গ্রন্থের প্রথম অংশ কুরআন মাজীদের আয়াত এবং দ্বিতীয় অংশ হাদীছ শরীফের নাসিখ ও মানসূখ সংক্রান্ত। লাহোরের 'আহমাদী প্রেস' থেকে ১৩১৮ হিঃ/ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৯৪]

(৮) **আওনুল বারী ফী হাল্লে আদিল্লাতিল বুখারী (আরবী)ঃ** শায়খ হুসাইন বিন মুবারক রচিত 'কিতাবুত তাজরীদ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে বুখারী শরীফের মতনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১২৯৭ হিজরীতে 'নায়লুল আওত্বার'-এর সাথে এবং ১২৯৯ হিজরীতে ভূপাল থেকে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

(৯) **আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ (আরবী)ঃ** ২ খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থে তিনি ছহীহ মুসলিম শরীফের মতনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন। এতে তিনি সনদ ও ইমাম নববীর অধ্যায় বিন্যাস বাদ দিয়ে নতুনভাবে অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। ১৩০২ হিজরীতে ভূপাল থেকে প্রকাশিত হয়।

(১০) **ফাতহুল আল্লাম শারহু 'বুলূগুল মারাম' (আরবী, ৪ খণ্ড)ঃ** হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী সংকলিত অনন্য হাদীছ গ্রন্থ 'বুলূগুল মারাম'-এর ভাষ্যগ্রন্থ। ইমাম ছান'আনী রচিত 'সুবুলুস সালাম'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এটি। এতে তিনি 'যায়দিয়া' মাযহাবের বক্তব্য বাদ দিয়েছেন। এটিকে তিনি বড় ছেলে নূরুল হাসানের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। ১৩০২ হিঃ/ ১৮৮৫ সালে কায়রোর 'আমীরিয়া প্রেস' থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

(১১) **মিসকুল খিতাম শরহে বুলূগুল মারাম (৪ খণ্ড)ঃ** ফারসী ভাষায় রচিত 'বুলূগুল মারাম'-এর বিস্তৃত ও প্রামাণ্য ভাষ্যগ্রন্থ এটি। একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।[৯৫]

(১২) **আর-রাওযুল বাসসাম (আরবী)ঃ** এতে তিনি 'বুলূগুল মারাম'-এর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও এর রচয়িতা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর জীবনী আলোচনা করেছেন।[৯৬]

(১৩) **আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ (আরবী)ঃ** কুতুবে সিত্তাহ তথা বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ-এর পরিচিতি এবং এ সকল গ্রন্থ সংকলকগণের জীবনী সংক্রান্ত একটি জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন যে, কুতুবে সিত্তাহ অধ্যয়ন করার পর তিনি এতদসংক্রান্ত এমন একটি পৃথক গ্রন্থের সন্ধান করতে থাকেন, যেটি ইলমে দ্বীন অর্জনকারীদের অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন পৃথক গ্রন্থ গোচরীভূত না হওয়ায় তিনি এ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।[৯৭] এ গ্রন্থটিকে তিনি একটি ভূমিকা, পাঁচটি অনুচ্ছেদ এবং উপসংহারে বিন্যস্ত করেছেন। এতে তিনি ইলম ও ওলামায়ে কেরাম এবং ইলমে হাদীছ ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের মর্যাদা ও ফযীলত, ইলমে হাদীছের সংজ্ঞা, সংকলন ও প্রসার, হাদীছ গ্রন্থাবলীর প্রকারভেদ, ইলমে হাদীছের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, হাদীছ গ্রন্থাবলীর স্তরবিন্যাস, কুতুবে সিত্তাহর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, সংকলকবৃন্দের জীবনী এবং এগুলির ভাষ্যগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি ইমাম মালেক ও তাঁর মুওয়াত্ত্বা এবং ইমাম আহমাদ ও মুসনাদে আহমাদ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

[চলবে]

৯৪. *হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ৩৪-৩৫; জুহূদু আহলিলহাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ২২-২৪; মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি, প্রবন্ধঃ নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান কী খিদমাতে কুরআন, আল-মা'আরিফ, লাহোর, জুলাই-আগষ্ট ১৯৮৬, পৃঃ ৬৩-৬৪।*

৯৫. *জুহূদু মুখলিছাহ, পৃঃ ৯৯-১০০; হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ৪২-৪৩, ৪৬; ইউসুফ ইলয়ান সারকীস, মু'জামুল মাতবূ'আত আল-আরাবিইয়াহ ওয়াল মু'আররাবাহ (কুম, ইরানঃ মানশূরাত আয়াতুল্লাহ, ১৪১০ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০৪; মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাংগুহী, যাফরুল মুহাছছিলীন বা-আহওয়ালুল মুছান্নিফীন (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তাবি), পৃঃ ২৪৯।*

৯৬. *নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, আর-রাওযুল বাসসাম (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৩৮০ হিঃ/ ১৯৬৮ খৃঃ), পৃঃ ১-১২।*

৯৭. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ১১-১২।*

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

সাহেব বাজার, রাজশাহী

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।

বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

ঘাতক ব্যাধি হেপাটাইটিস -সি

হেপাটাইটিস-সি বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম ভয়ঙ্কর সংক্রামক ঘাতক ব্যাধি। মাত্র বিশ বছর আগেও এ ঘাতক ভাইরাসটি সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা ছিল না। এটি প্রথম আবিস্কৃত হয় ১৯৮৮ সালে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ২৪০ মিলিয়ন মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত বলে ধারণা করা হয়। এযাবৎ আবিস্কৃত হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হ'ল হেপাটাইটিস-সি। এর কারণ কমপক্ষে তিনটি। প্রথমতঃ এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হ'লে প্রাথমিক পর্যায়ে শরীরে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। এটি নীরবে শরীরে ঢুকে এবং খুব নীরবে তার ঘাতক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। যখন ধরা পড়ে তখন মানব দেহের লিভার একদম অকেজো হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ৭০-৮০% দীর্ঘস্থায়ী লিভার অসুখ যেমন সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সারে ভুগে থাকেন। যার পরিণাম নির্ঘাত মৃত্যু। তৃতীয়তঃ এ ভাইরাসটির বিরুদ্ধে টিকা বের করতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন এবং আজ পর্যন্ত সেটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

যেভাবে ছড়ায়ঃ হেপাটাইটিস-সি প্রধানতঃ ছড়ায় রক্ত এবং রক্তজাত দ্রব্যের মাধ্যমে। তাই যেসব রোগীর বিভিন্ন কারণে বারবার রক্ত নিতে হয় তাদের এ ভাইরাসটি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। বিশেষ করে যারা শিরায় ইনজেকশন ঢুকিয়ে নেশা করে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত থাকলে অন্যজনও আক্রান্ত হ'তে পারেন। সন্তান সম্ভবা মা আক্রান্ত হ'লে হবু সন্তানের শরীরে এটি ছড়াতে পারে।

রোগের উপসর্গঃ শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস-সি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। মাত্র ১০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ক্লান্তিভাব, জন্ডিস প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কয়েক বছর পর আক্রান্ত ব্যক্তি ভুগে থাকেন দীর্ঘস্থায়ী লিভার অসুখ যেমন সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সারে। এ সময় পেটে পানি এসে যাওয়া ছাড়াও নানাবিধ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেকে ভুগতে পারেন কিডনীর প্রদাহ কিংবা অস্থিসন্ধির ব্যথায়।

চিকিৎসাঃ হেপাটাইটিস-সি এর বিরুদ্ধে কার্যকরী তেমন কোন ওষুধ নেই। অনেক ক্ষেত্রে ইনটারফেরন নামক একটি ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইন্টারফেরন চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এটি ব্যবহারে সাফল্যের হার মাত্র ১০-২০% এবং রোগটি আবার দেখা দিতে পারে। বর্তমানে ইন্টারফেরনের সাথে রিবাভিরিন নামক ওষুধটি ব্যবহৃত হচ্ছে। রিবাভিরিন মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকা ভেঙ্গে ফেলে এবং রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। রিবাভিরিনের আরেকটি মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হ'ল গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করলে গর্ভপাত হ'তে পারে। তাই গর্ভবস্থায় এটির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শেষ কথাঃ হেপাটাইটিস-সি সবচেয়ে মারাত্মক হেপাটাইটিস ভাইরাস। এটি একটি নীরব ঘাতক। এর সঠিক কোন চিকিৎসা নেই। এর বিরুদ্ধে কোন টিকা নেই। এ রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বাড়তি সতর্কতা। রক্তদান এবং রক্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হ'তে হবে।

॥ সংকলিত ॥

সুস্থ, দীর্ঘ জীবন এবং রংধনু খাদ্য

দুঃখজনক হ'লেও সত্যি সভ্যতা ও প্রযুক্তির এ যুগে আমরা এখনো জানি না দীর্ঘ জীবন ও সুস্থতার জন্য সঠিক খাদ্য কি? আমরা প্রতিদিন যা খাচ্ছি তা ব্যালেন্স ডায়েট হচ্ছে কি-না, পুষ্টির ভারসাম্য হচ্ছে কি-না আমরা জানি না। আমাদের শরীর নিজেই সবচেয়ে বড় চিকিৎসক। তার রয়েছে অটোহিলিং সিষ্টেম, শরীরের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে অস্বাভাবিকতা, অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও নিরাময়ের। সেল ডিভিশন, ক্ষয় পূরণ, জারন-বিজারন, তাপ শক্তি নিয়ন্ত্রণ, হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে অক্সিজেন কোষে কোষে পৌছানো, যা খাচ্ছি তার পুষ্টি কোষে কোষে পৌছানো, প্রতিটি কোষের কর্মতৎপরতার ডিএনএ বা জিনের কর্মতৎপরতা সব কিছুই চলছে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত গতিতে। এই গতিকে চালানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক ফুয়েল বা জ্বালানি। যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাযথ জ্বালানি দেয়া যায় তবে রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে না।

এই ফুয়েল বা জ্বালানি হ'ল আমাদের গ্রহণ করা খাদ্য। এই খাদ্য যদি যথাযথ অর্থাৎ ফাইটো কেমিক্যাল না হয় তবে শরীরের অটো হিলিং সিষ্টেমে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে অসুস্থতা বাসা বাঁধে। বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়। আমরা দেশ, বিশ্ব, তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু নিয়ে যতটা ভাবছি তার তুলনায় নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা ভাবছি না। যেমন- কতটুকু কার্বোহাইড্রেড, কতটুকু প্রোটিন, কতটুকু ফ্যাট, কতটুকু ভিটামিন ও মিনারেল, কতটুকু পানি পান প্রয়োজন যদি জানা থাকতো, তবে চিকিৎসা চেম্বারগুলো এত রুগীতে গিজগিজ করত না। ডাক্তাররাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে সময় দিতে পারতেন।

আসুন, আজ জানার চেষ্টা করি রংধনু খাদ্য কাকে বলে? প্রকৃতিতে এত রংয়ের ফল এবং সবজি থাকতে আমরা অধিকাংশই এক কালার সবুজ সবজি বাজার থেকে কিনছি। সাত রং মিলে রংধনু হয়। তেমনি সাত রংয়ের ফল সবজি মিলে রংধনু খাদ্য হয়। কালার কম্বিনেশন আজকাল ইউরোপে আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার হচ্ছে 'ফাইভ কালার এ ডে' অর্থাৎ 'প্রতিদিন ৫ রংয়ের খাদ্য খাও'।

আমরা কতজন তা জানি এবং মানি। অথচ আমেরিকা ও ইউরোপে ব্যাপক কার্যক্রম চলে এর উপর। আমেরিকায় সেপ্টেম্বর মাসকে 'ফাইভ কালার এ ডে' হিসাবে পালন করে। লাল, সাদা, সবুজ, কমলা/হলুদ, নীল/পারপেল রংয়ের সবজি এবং ফল আমাদের দেশের যেকোন বাজারে পাওয়া যায়।

লাল ফল এবং সবজিতে যে ফাইটো নিউট্রিয়েন্স রয়েছে যা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে, মেমোরী ফাংশন, ইউরোনারী স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং বেশ কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। লাল সবজি বা ফল যেমন- লাল টমেটো, বিট, লাল আলু, লাল শাক, লাল তরমুজ ইত্যাদি। সাদা ফল/সবজি হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে, ভাল কোলেষ্টেরল (এইচ.ডি.এল) বাড়ায়। সাদা সবজি/ফলের মধ্যে সাদা ফুলকপি, সাদা মুলা, কেসোর আলু, মাসরুম, রসুন, পিঁয়াজ, আদা, আলু, কলা, লিচু, আতা প্রভৃতি।

সবুজ সবজি/ফল চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, হাড় ও দাঁত শক্তিশালী রাখে, বেশ কিছু ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা হ্রাস করে। সবুজ সবজি/ ফল বাজারে খুবই সহজলভ্য যেমন- সীম, করল্লা, বরবটি, ঢেঁড়শ, বাঁধাকপি, পালংশাক, পুঁইশাক, লাউশাক, পুদিনাপাতা, সবুজ পাতাসমৃদ্ধ সকল শাক-সবজি।

নীল/পারপেল ইউরোনারী স্বাস্থ্য, স্মরণশক্তি যথাযথ রাখে, বেশ কিছু ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, অকালপক্বতা বা বুড়িয়ে যাওয়া লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- পারপেল বাঁধাকপি, পারপেল গাজর, লঙ্কা/গোলমরিচ, বেগুন, জাম, নাশপতি, খেজুর, নীল আঙ্গুর প্রভৃতি।

কমলা/হলুদ সবজি/ফলে রয়েছে ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। হৃৎযন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে, দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে, বেশ কিছু ক্যান্সারে ঝুঁকি হ্রাস করে। যেমন- বাজারে পাওয়া যায় গাজর, মিষ্টি কুমড়া, হলুদ টমেটো, মিষ্টি আলু, পাকা পেঁপে, হলুদ বাঙ্গি, কমলা, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, আনারস, তরমুজ, আঙ্গুর প্রভৃতি। সবজি এবং ফলের রঙ্গিন রং হয় গাছের পিগমেন্ট থেকে। যাকে বলে ফাইটো কেমিক্যাল। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত দশ হাযারের উপরে ফাইটো কেমিক্যাল ফল ও সবজি পেয়েছেন এবং প্রতিটি ফাইটো কেমিক্যালের রয়েছে সুনির্দিষ্ট এবং আশ্চর্যজনক ক্ষমতা, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করে।

প্রতিদিনের খাবার ও নাস্তা গ্রহণের সময় দেখুন কয়টি রং যোগ হ'ল আপনার খাবার প্লেটে। খাদ্য রঙ্গে রঙ্গিন হ'ল কি-না (কখনই কৃত্রিম রং নয়)। মনে রাখুন ৫ কালার প্রতিদিন সাত রংয়ের রংধনু সবজি থেকে বেছে নিন অন্তত ৫ কালার। প্রাকৃতিক ৫ রং এবং সেই সাথে নিয়মিত হাঁটা/জগিং/সাঁতার কাটা/সাইকেল চালানো/বাগান করা অথবা যে কোন ব্যায়াম। সুস্থতা আপনারই হাতে।

॥ সংকলিত ॥

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

মাওলানা আবু তাহের প্রণীত 'কারাগার নয় ঈমানী পরীক্ষা' বইটি বের হয়েছে। বইটির মূল্য ৪০/= (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

এতে রয়েছে-

- মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জঙ্গীবিরোধী ভূমিকা।
- ২০০৫ সালে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও সোনামণি'র গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের তালিকা।
- লেখকের কারা জীবন বৃত্তান্ত।
- সন্ত্রাস ও চরমপন্থা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইলঃ ০১৭১৮-৫৭০০১৩

০১৭১১-৯৪৪৯১১

নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের জন্য সুখবর

যে সমস্ত মহিলার গর্ভে সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করিয়েছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাদের হতাশার কোন কারণ নেই। এখানে নিঃসন্তান বন্ধ্যা দম্পতিদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে হতাশাগ্রস্ত অগণিত নিঃসন্তান দম্পতি কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করেছেন। সন্তানহীনারা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক

ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা) ২য় স্থান প্রাপ্ত।

রেজিঃ নং ৫২৮৬

নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যা বিষয়ক গবেষক ও চিকিৎসক।

কলেজ বাজার, বিরামপুর, যেলা-দিনাজপুর।

মোবাইলঃ ০১৭১৮-৬৯০৫৭১।

ক্ষেত-খামার

মিষ্টি কুমড়ার পুষ্টিগুণ

মিষ্টি কুমড়া আমাদের দেশে অতি পরিচিত এবং জনপ্রিয় একটি সবজি। এটি জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে দু'টি কারণ রয়েছে। তাহ'ল সারা বছরই কম বেশী মিষ্টি কুমড়ার ফলন হয় এবং পাকা মিষ্টি কুমড়া অনেক দিন ঘরে রাখা যায়। মিষ্টি কুমড়ার পাতা ও ডগা শাক হিসাবে খাওয়া হয়। এর ফুলের বড়াও অত্যন্ত সুস্বাদু। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে গাঢ় সবুজ শাক, হলুদ কমলা রংয়ের সবজি এবং ফলে প্রচুর ক্যারোটিন থাকে, যা দেহে গিয়ে ভিটামিন 'এ' তৈরী করে। সে হিসাবে মিষ্টি কুমড়াও ক্যারোটিন সমৃদ্ধ সবজি। প্রতি ১০০ গ্রাম মিষ্টি কুমড়ায় যে সমস্ত পুষ্টি উপাদান আছে তা হ'ল ভিটামিন 'এ' ৭২০০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি ২৬ মিঃ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৪৮ মিঃ গ্রাম, শর্করা ৪.৫০ গ্রাম, আমিষ ১.৪০ গ্রাম, স্নেহ ০.৫ গ্রাম, ভিটামিন বি ০.০৭ মিঃ গ্রাম, ভিটামিন 'বি' ২০ মিঃ গ্রাম ও খাদ্যশক্তি ৩০ কিঃ ক্যালরি। মিষ্টি কুমড়ায় রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন 'এ', যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে চোখ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় এক লাখ শিশু ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। অথচ ভিটামিন 'এ'-এর সস্তা ও সহজলভ্য উৎস হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া। এ সম্পর্কে পিতা-মাতার অজ্ঞতাই শিশুর অন্ধত্বের কারণ হয়।

পুকুরে শোল মাছ চাষ

দেশীয় মাছের জগতে শোল মাছ অতি পরিচিত। প্রতিটি হাট-বাজারেই এ মাছ সহজলভ্য। শোল, ল্যাটা, শাল একই জাতীয় মাছ। সাপের মাথার মতো মাথা হওয়ায় এদের দেখতে কুশ্রী দেখায়। তাই সম্মিলিতভাবে ইংরেজিতে এ মাছের নামকরণ হয়েছে Snakehead।

এদের দেহে রয়েছে পর্যাপ্ত সাদা শক্ত মাংস। মাছের কাঁটাগুলো খুবই মসৃণ। স্বাদু পানির মাছ হয়েও নদীর মোহনায় ঈষৎ লবণাক্ত পানিতেও এরা স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে পারে। পুকুর, দীঘি, খাল-বিল, ডোবা-নালা, জলমগ্ন নিচু জমিতে সাধারণত এদের বাস।

প্রধানত তিনটি সমস্যা শোল চাষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমস্যাগুলো যে জটিল এতে সন্দেহ নেই। প্রথম সমস্যা হচ্ছে এরা মৎস্যভুক। এরা অন্য মাছ খেয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না; বরং পুকুরে খাবারের অভাব ঘটলে পেটের জ্বালা মেটাতে নিজ সন্তানদেরও খেয়ে ফেলতে কছুর করে না। দ্বিতীয়তঃ এ জাতীয় মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র রয়েছে। ফলে ভেজা কাদায় গর্ত করে অনায়াসেই আত্মগোপন করতে পারে। কাদায় আত্মগোপনের প্রবণতা বা অভ্যাসের কারণে জাল দিয়ে সম্পূর্ণ মাছ ধরা যায় না। পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে পুকুর সম্পূর্ণ শুকিয়ে বা রোটেনন প্রয়োগেও এ জাতীয় মাছ উচ্ছেদ করা যায় না। তৃতীয়তঃ শোল মাছ পানির পোকা-মাকড়, পানির ক্ষুদে প্রাণী, চিংড়ি, কেঁচো ইত্যাদি খেতে ভালবাসে। জীবন্ত খাবার খেতেই এরা অভ্যস্ত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শোল মাছ এক বছরে এবং উষ্ণ অঞ্চলে দেড় থেকে দু'বছরে দৈহিক পূর্ণতা লাভ করে।

বংশ বৃদ্ধিঃ বদ্ধ পানিতে এরা ডিম ছাড়ে। সাধারণত বর্ষাকালে এরা প্রজনন কার্য সমাধা করে। এ সময়ে জলাশয়ে পরিমিত পানি থাকে। ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে না। পানিতে প্রজননোপযোগী তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রী থেকে ৩০ ডিগ্রী সেঃ থাকতে হয়। এক অভিনব পন্থায় শোল মাছ প্রজনন কাজ সমাধা করে। প্রজননের আগে পরিপক্ব একটি পুরুষ শোল ও পরিপক্ব একটি স্ত্রী শোল নিরাপত্তার জন্য পুকুরে সুবিধাজনক একটি এলাকা খুঁজে বের করে। এলাকার জলজ আগাছা কেটে বৃত্তাকার একটি পরিষ্কার এলাকা 'প্রজনন ক্ষেত্র' হিসাবে চিহ্নিত করে। সময়মতো নিষিক্ত ডিম পানির উপরিভাগে ভেসে ওঠে এবং ডিমগুলো একত্রে একটি পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে পুরুষ মাছটি আবরণটির আশপাশে কোথাও অবস্থান করে। এ সময় ব্যাঙ, সাপ ও অন্যান্য মৎস্যভুক মাছ এ ডিম যাতে ধ্বংস করতে না পারে এবং তাদের হামলা প্রতিহত করার জন্য পুরুষ মাছ সার্বক্ষণিক পাহারা দেয়। মাত্র তিন দিনেই ডিম থেকে পোনা ফুটে বের হয়। ক্ষুদে পোনা অল্প সময়েই সাঁতার কাটতে শুরু করে। কিন্তু তাদের অক্সিজেন গ্রহণ এবং ক্লান্তি দূরের জন্য পানির উপরিভাগে আসতে হয়। এ সময় পোনাগুলো দলবদ্ধভাবে ঘোরাফেরা করে। শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা এবং পোনার নিরাপত্তার জন্য পুরুষ মাছটি তখনো অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পাশে থাকে। নয় সপ্তাহ ধরে এরা দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে।

কৃত্রিম প্রজননঃ কৃত্রিম প্রজননের সাহায্যে এক কেজি ওযনের একটি স্ত্রী মাছ থেকে দশ হাযার ডিম পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে শোল মাছের পোনা খুবই সহজলভ্য হওয়ায় কৃত্রিম প্রজননের কোন প্রয়োজন হয় না।

সতর্কতাঃ মজুত পুকুর বা যে সমস্ত পানির আগাছা পাড়সংলগ্ন কেবলমাত্র সে সমস্ত আগাছা রেখে বাদবাকি আগাছা সরিয়ে ফেলতে হবে। পাড়সংলগ্ন ছোট আগাছা পানির পোকা-মাকড়কে আশ্রয় দেবে। কৃত্রিম খাবার শোল মাছের অপসন্দ। শোল মৎস্যভুক এবং মাংসাশী। তাই পুকুরে শোল চাষের আগে ছোট মাছের আবাদ করতে হয়। মৎস্য বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ সমস্ত আবাদী ছোট মাছকে Forage fish বলা হয়। ছোট আকারের মাছকে Forage fish হিসাবে নির্বাচন করা হয়। কাঁটাযুক্ত পাখনা এবং চ্যাপ্টা শরীরবিশিষ্ট মাছ নির্বাচন করা যাবে না। যে সমস্ত মাছের দেহ নরম, পুকুরে প্রজনন করে, প্রতিবার প্রচুর পোনা উৎপাদনে সক্ষম এবং অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে পূর্ণতা লাভ করে কেবলমাত্র সে সমস্ত মাছকেই Forage fish হিসাবে নির্বাচন করা যায়। যেমন পুঁটি এবং চেলা ইত্যাদি। তেলাপিয়া নির্বাচনে মৎস্য বিশেষজ্ঞরা দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। মে মাসে প্রতি আড়াই একর মজুত পুকুরে ১১শ' থেকে ১৫শ' প্রজননোপযোগী Forage fish ছাড়তে হবে। এ মাছের খাবারের জন্য পুকুরে প্ল্যাংটনের প্রয়োজন। প্ল্যাংটনের অভাব ঘটলে পরিমিত গোবর বা সবুজ সার (Compost) প্রয়োগে প্ল্যাংটন তৈরী হবে। আগষ্ট মাসে প্রতি একরে ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এক হাযার পোনা ছাড়তে হবে। খাদ্য হিসাবে এ সময়ে চাল, কুড়া বা খৈল প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। শোল মাছ যাতে এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য পুকুরের সব পাড়ে বাঁশ বা তারের বেড়া তৈরী করা দরকার।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

আত্মবেদনা

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
রাণীগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশের কথা বলি
তবুও আমি দেশদ্রোহী
দেশের পক্ষে লিখতে গিয়ে
হ'লাম শেষে রাষ্ট্রদ্রোহী (?)
দেশকে আমি ভালবাসি
জীবন থেকে আরো বেশী
দেশের জন্য কাজ করে কি
হ'লাম শেষে অপরাধী?
জঙ্গীবাদকে ঘৃণা করি
ঝুঁকি নিয়ে কলম ধরি
তাই বুঝি ভাই অবশেষে
পেলাম লক্বব জঙ্গীবাদী।
বোমাবাজদের বিরুদ্ধে মোর
কলম যখন অস্ত্রসম
গা বাচাঁতে চাইনি বলেই
মামলা হ'ল ডজন সম।
বলছি কথা আমার দেশের
বলে যাব জীবন ধরি
কি পেয়েছি কি পাব তার
হিসাব-নিকাশ নাহি করি।
মহান রবের অসীম কৃপায়
মুক্ত-স্বাধীন হবই জানি
এই দেশেতেই প্রমাণ হবে
কে নির্দোষ আর কে যে দোষী।
ভুলে গেছ সব ইতিহাস
স্বাধীনতা আনল কারা?
বালাকোটের ভয়াল দিনে
একাত্তরে মরল যারা।
তাদের তরে এই অবিচার
সইবে না যে আল্লাহ তা'আলা
থাকতে সময় তওবা কর
নির্দোষকে পরাও মালা।

***

আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন '০৬

-মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

রাজধানী ঢাকার পল্টনে
উনিশ শ' ছয় সালের ২ জুনে
আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসমাবেশ।
সারা দেশের লোক ছুটছে তাই
পল্টনে হবে এক জায়গায়
তাওহীদী শ্লোগানে কাঁপিয়ে আকাশ
জাগাবে এবার বাংলাদেশ।
দুঃখ-ক্ষোভের নেইকো শেষ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
জোট সরকারের ক্ষমতার দণ্ড
এখন যেন তার হাতে।
ঐ মাঠ ওদের বাপ-দাদার
ওরা যেন তার দখলদার
বার বার মোরা প্রোগ্রাম করেও
পাই না যে ঠাঁই কোন মতে।
অবশেষে কি করি উপায়
মুক্তাঙ্গনে লইয়া ঠাঁই
জানাই অন্যায় অবিচারের কথা
যুলুমবাজ জোট সরকারের।
সন্ত্রাস-নৈরাজ্য করি চুরমার
ডঃ গালিব সহ মুক্তির দাবী ছিল চার নেতার
'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আলেম-ওলামা
উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়,
ডঃ মুছলেহুদ্দীন ভারপ্রাপ্ত আমীর
সভাপতি ছিলেন সভাটির
নির্ভীক কণ্ঠে জ্বালাময়ী ভাষণে
জোট সরকারকে জানিয়ে দেয়।
এদেশ জানলে বিশ্ব জানবে
মুসলিম মনে চেতনা আনবে
ঘুচবে সংশয়-সন্দেহ,
এ আন্দোলনের নেতা যে
আল্লাহ্‌র মাহবূব রাসূল সে
ধরণীর বুকে হাদীছ আনার
নেই বুঝি আর নেই কেহ।
তাই করি এ আন্দোলন
বিশ্বে ঘটাতে বিস্ফোরণ
পরিচয় মোদের আহলেহাদীছ
নেইকো ভিন্ন নামকরণ।
জঙ্গীবাদের ধারি না ধার
তাই বই লিখেছেন গালিব স্যার
করি না কখনও অগ্নি সংযোগ
ভাঙচুর কিছু এই দেশের।
আল্লাহ ও রাসূলের পথ ধরে
আন্দোলন মোরা যাই করে
বিশ্বে নেইকো দরগাহ-মাযার
খাই না হারাম আয় করে।
জাগ্রত জ্ঞানে আল্লাহ্‌র পথে
ডাকি যে বিশ্ব মুসলিমে

অহি-র বিধান ছহীহ হাদীছের
সরল-সোজা পথ জেনে।
পীর-মুরীদের পথ বাঁকা
আখেরাতে পাবে সব ফাঁকা
তাই মোরা ডাকি আল্লাহ্‌র পথে
এ পথ যেন লয় চিনে।
জঙ্গীবাদের সন্দেহে
গ্রেপ্তার করে রেখেছ যে
মিথ্যা মামলা চাঁপিয়ে কেন
চালাও যুলুম অত্যাচার।
মাস যায় বছর যায়
কোন অন্যায়ের প্রমাণ নেই
তবুও কেন দাও না মুক্তি
থাকছ কেন নির্বিকার।
শত জ্ঞানীগুণী আলেমদের
কারা মাঝে কাটে সময় ঢের
কোন অপরাধে জেলে পুরে রাখ
চাই উচিৎ তার জবাব ফের।
মহা বিচারক আছেন বসে
পড়বে কখন তাঁর রোষে
বাঁচতে হ'লে ছাড় সবারে
নইলে পাবে সবাই টের।

***

আজব দেশ আজব রাজা

-আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দনগর, নওগাঁ।

আজব দেশ আজব রাজা
অপরাধী জামাই সাজে
নিরপরাধ পায় সাজা।
আজব দেশে আজব মানুষ
আজব কাণ্ড কারখানা,
যালেম থাকে মহাসুখে
মযলূম যায় জেলখানা।
আজব দেশের পণ্য ভেজাল
ভেজাল খাদ্য দ্রব্য,
কৃষক-শ্রমিক পায় না দেশে
শ্রমের নায্য মূল্য।
আজব দেশের সবখানে
চলছে দেদার দুর্নীতি,
দেখে-শুনে চুপটি থাক
নইলে তোমার দুর্গতি।
আজব দেশে সাঁঝের বেলা
ঘরে-ঘরে মোমবাতি
শিক্ষার্থীরা পাঠবিমুখ
এ কোন আজব রাজনীতি।
দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি
চলছে আজি বাজারে,
চারিদিকে রব উঠেছে
এ কোন আজব রাজারে?

***

জবাব চাই

-আবুল কাসেম
গোবীপুর, মেহেরপুর।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি দুনিয়ায়
মিথ্যাচারের অন্ত নেই
সারা দেশে দেখলাম ঘুরে
আসল মানুষ পাওয়া দায়।
নিঃষ্কলঙ্ক মানুষ তবু
বন্দী কেন গালিব ভাই,
হচ্ছেন কেন নিষ্পেষিত
জোট সরকার জবাব চাই।
দু'দিনের এই ভ্রান্ত ভবে
যালিম শাসক প্রমাণ হবে
হিসাব তোমায় দিতে হবে
নইলে কিন্তু রক্ষা নাই।
দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায়
ভুলিসনে দেশবাসী
মিথ্যাজালে পা বাড়ালে
পড়বে গলায় ফাঁসি।
হুঁশিয়ার বাতিলের দল
ভাঙবে তোদের চক্রকল
বুকেতে বেঁধেছি বল
তাওহীদী ঢাল হাতে তাই।

***

অপূর্ব সাথী

-মুহাম্মাদ মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

আমার জীবনে আমি পেয়েছি এক অপূর্ব সাথী,
তন্দ্রা-নিদ্রা টুটে যায়, যখনি কাছে পাই দিবারাতি।
তার ভাব-গম্ভীর মিষ্ট ভাষায়, আমার হৃদয় নাচে,
হতবাক হয়ে চেয়ে থাকি, যখনি বিলম্বে পৌঁছে।
রীতি সম্ভারে পূর্ণ উদর, তাই এত সংলাপ,
কত যে পাগল-পাগলিনী তার সাথে জমিয়েছে ভাব।

***

জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে
ঈমানের মশাল নিয়ে এগিয়ে এসো
হে যুবক! জান্নাতের সুগন্ধি
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

প্রথম কর ন্যায়পাল

দেশের প্রথম কর ন্যায়পাল হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এনবিআর চেয়ারম্যান খায়রুযযামান চৌধুরীকে। তাঁর এ নিয়োগ ৪ বছর মেয়াদের জন্য। কর ন্যায়পাল পদটি হবে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতির সমমর্যাদার। দাতা দেশ ও সংস্থাগুলির অব্যাহত চাপে ২০০৫ সালের ১০ জুলাই জাতীয় সংসদে 'কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা, ন্যায়ানুগ আচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'কর ন্যায়পাল আইন' পাস হয়। কর কর্মকর্তাদের দ্বারা করদাতাদের হয়রানি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে। এছাড়া বর্তমান কর প্রশাসনে স্বচ্ছতার যে অভাব রয়েছে, তা বিভিন্ন সময়ে সরকারী মহল থেকেও স্বীকার করা হচ্ছে। আর এ দুই কারণেই কর রাজস্ব খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কর খাতের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল যরূরী। যাহোক শেষ পর্যন্ত এই লক্ষ্যে গত বছরে প্রণীত আইন অনুযায়ী কর ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়েছে এবং চলতি মাস থেকেই কর ন্যায়পাল কাজ শুরু করবেন। নবনিযুক্ত কর ন্যায়পাল খায়রুযযামান চৌধুরী বলেছেন যে, কর ন্যায়পাল হিসাবে তিনি কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাবেন এবং তাঁর প্রধান দায়িত্বই হবে কর দাতাদের হয়রানি বন্ধ করা। কোন কর কর্মকর্তা কোন করদাতাকে হয়রানি করছে, এরূপ প্রমাণিত হ'লে কর ন্যায়পাল তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবেন। এক্ষেত্রে নিজেকে পক্ষপাতমুক্ত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা তাঁর থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক

প্রথমবারের মত দেশের নাগরিকদের জন্য জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৮৭৩ সাল থেকেই নাগরিকদের জন্য জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন থাকলেও প্রচলিত আইনে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় দেশের নাগরিকদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই এখন পর্যন্ত নিবন্ধিত হয়েছেন। ২০০৪ সালে প্রণীত নতুন আইনের আলোকে গত ৩ জুলাই থেকে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যকর ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে দেশের ৬৪টি যেলার ৬৪টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে শতভাগ জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। ৩ জুলাই থেকে কার্যকর সার্বজনীন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে দু'বছরের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে এই রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রতিজন নিবন্ধিত নাগরিককে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নাগরিক সনদপত্র দেয়া হবে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোন রকম ফি না নিয়ে জন্ম নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই এ সময়ের মধ্যে নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা কার্যালয় থেকে এই সনদপত্র সংগ্রহ করতে হবে। জন্ম নিবন্ধন ছাড়া ২০০৮ সালের পর কোন নাগরিক ভোটার হ'তে পারবে না। স্কুলে ভর্তি, সরকারী-বেসরকারী চাকুরি, ব্যাংক একাউন্ট খোলা, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভূমি রেজিষ্ট্রি, বিয়ে এবং নাগরিক সনদপত্রের জন্য জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যথায় জরিমানাসহ শাস্তির বিধান রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষকদের সহায়তায় সকল শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন করা হবে এবং এ পর্যায়ে শতকরা ২৩ ভাগ নাগরিকের নিবন্ধন সম্ভব হবে বলে ২ জুলাই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। অবশিষ্ট ৭৭ ভাগ নাগরিকের জন্ম নিবন্ধনের কাজ টাস্কফোর্স এবং স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে সম্পন্ন করবেন বলে জানানো হয়েছে।

সন্তানের চিকিৎসার অর্থ যোগাতে ব্যর্থ পিতার আত্মহত্যা

অসুস্থ কন্যাদের চিকিৎসার অর্থ যোগাতে ব্যর্থ হয়ে মফীযুল ইসলাম (৪০) নামের এক পিতা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ১৪ জুলাই শুক্রবার রাতে নীলফামারী সদরের ইটাখোলা ইউনিয়নের কানিয়ালখাতা গ্রামে। মফীযুলের স্ত্রী শাহিদা বেগম জানায়, তার ৩ শিশু কন্যা কয়েকদিন থেকে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। অর্থাভাবে তাদের চিকিৎসা সম্ভব না হওয়ায় ঘটনার দিন সকালে স্বামীর সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়। এ ঘটনায় অভিমানে বাড়ী থেকে ১ কিলোমিটার দূরে গাছে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ

দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। এর মধ্যে ঢাকায় ৩০ হাযার, চট্টগ্রামে ১০ হাযার, খুলনায় ৮ হাযার, রাজশাহীতে ৬ হাযার, বরিশালে ৪ হাযার, সিলেটে ৪ হাযার, ১২টি বড় যেলা শহরে গড়ে ৩ হাযার করে ৩৬ হাযার, ৪৮টি ছোট যেলা শহরে গড়ে ২ হাযার করে ৯৬ হাযার, উপযেলা সদর ও পৌরসভাগুলির প্রতিটিতে গড়ে ৫শ' জন করে এবং ৪ হাযার ৪শ' ইউনিয়নের প্রতিটিতে গড়ে ৭৫ জন করে ভিক্ষুক রয়েছে। গত ২২ জুন ঢাকার সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' আয়োজিত 'ভিক্ষাবৃত্তিঃ সমস্যা ও প্রতিকার' শীর্ষক এক কর্মশালায় এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

গাড়ী, শিশু, মোবাইল ফোন চুরি রোধ প্রযুক্তি এখন বাংলাদেশে

গাড়ী চুরি, শিশু চুরি, মোবাইল ফোন বা যে কোন মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি কিংবা হারিয়ে যাওয়া প্রতিরোধের প্রযুক্তি

এখন বাংলাদেশেও চলে এসেছে। গাড়ীতে কিংবা মোবাইল ফোনে অথবা শিশুদের হাতে ঘড়ির মতো ছোট্ট এই ডিভাইসটি আটকে রাখলে সেটি কখন কোথায় অবস্থান করছে তা ঘরে বসেই যে কোন সময় জানা সম্ভব হবে। এমনকি ছেলে-মেয়েরা বাড়ীর বাইরে কোথায় কখন কতদূরে অবস্থান করছে তাও প্রতি মুহূর্তে জানা যাবে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাহায্যে দু'টি ডিভাইসের জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেমস) পদ্ধতির মাধ্যমে এ তথ্য পাওয়া যাবে। দু'প্রান্তে রাখা এ দু'টি ডিভাইসে গ্রামীণ ফোনের জিপিআরএস প্রযুক্তির সিম ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে প্রতি মুহূর্তেই এক পক্ষ অপর পক্ষের অবস্থান ও ক্রিয়াকলাপ জানতে পারবে। আর এই ডিভাইসের প্রতিটির দাম হচ্ছে মাত্র ৩০ হাযার টাকা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পুরো সিষ্টেমটি আয়ত্তে রাখার জন্য প্রয়োজন হবে ৩ লাখ টাকা। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিডিকম অনলাইন লিমিটেড (ফোনঃ ৮৬১০৯১৭-৮) দক্ষিণ আফ্রিকার এ্যাস্ট্রাটা কোম্পানির সহযোগিতায় বর্তমানে এটি বাজারজাত শুরু করেছে।

জানা গেছে, এই ডিভাইসটি গাড়ীর কোন গোপন স্থানে রেখে দিলে এটি প্রতি মুহূর্তে গাড়ীটির অবস্থানের এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সংকেত পাঠাবে। ফলে এর মাধ্যমে গাড়ী চুরি এবং গাড়ীর অপব্যবহারও রোধ করা সম্ভব হবে। মালিক ইচ্ছা করলে এই ডিভাইসটিতে সংকেত পাঠিয়ে তার গাড়ীটি স্থায়ীভাবে বন্ধও করে দিতে পারবেন অথবা এর চলাচল নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন। গাড়ী ছাড়াও যেকোন মূল্যবান জিনিসপত্রেও ক্ষুদ্রাকৃতি এ ডিভাইসটি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব।

দুর্নীতির শীর্ষে এলজিআরডি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়

'টিআইবি'র সমীক্ষায় এবার দেশে দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান লাভ করেছে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। টাকার অংকে বেশী দুর্নীতি হয়েছে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয় হচ্ছে শিক্ষা। দুর্নীতির দিক দিয়ে এর পরেই রয়েছে বিদ্যুৎ ও বন বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং বেসরকারী খাত। ২০০৫ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশের ২৬টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ৩৮টি বিভাগের দুর্নীতির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) এই তালিকা প্রকাশ করেছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ৩৮টি বিভাগের দুর্নীতি সংক্রান্ত ২ হাযার ১২৮টি ঘটনার মধ্যে 'টিআইবি' বিবেচিত ৪২৩টি ঘটনায় যে মোট ৫২৬ কোটি ২৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়, তার মধ্যে একা এলজিআরডি মন্ত্রণালয়েই ক্ষতি হয় ২০৮ কোটি ৯ লাখ ১৭ হাযার ২৫২ টাকার পরিমাণ। এর পরই রয়েছে বিদ্যুৎ ও বন বিভাগের স্থান। এই দুই বিভাগে ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ৬৭ কোটি ৯৯ লাখ টাকা এবং ৬৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা। দুর্নীতির সংখ্যার দিক থেকে অবশ্য সকলের শীর্ষে রয়েছে শিক্ষা বিভাগ। বলা বাহুল্য, এখানে যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে আসলে দুর্নীতিজনিত লোপাট।

টিআইবি প্রধান ডঃ মোযাফফর আহমাদ বলেন, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের শীর্ষে আসার কারণ হ'ল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, এলজিইডি, ওয়াসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের দফতর সমূহে সর্বোচ্চ পরিমাণ লুটপাট ও আত্মসাৎ। স্থানীয় সরকারসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা অধিক থাকায় এসব জায়গায় ফাণ্ডের অপব্যবহার ও তসরুফও সর্বোচ্চ। এদের কাজের মান সর্বনিম্ন এবং এদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার ও আমলারা একজোট হয়ে এই আত্মসাতের কাজ চালায় বলে রিপোর্টে প্রকাশ।

ল্যান্ড ফোনে প্রি-পেইড কার্ড

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) গত ১৭ জুলাই থেকে ফিক্সড ফোনে প্রি-পেইড কলিং কার্ড সার্ভিস চালু করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমীনুল হক ঢাকার মগবাজারের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনে এ কার্ডের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, এই ব্যবস্থায় ফিক্সড ফোনের সংযোগ নেই এমন ব্যক্তিও ফিক্সড ফোনের সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

প্রি-পেইড কলিং কার্ড সার্ভিস চালু হওয়ায় বিটিটিবি'র যে কোন ফোন ব্যবহার করে কোড ০১০২০১ ডায়াল করে সারাদেশ হ'তে আইএসডি ও ইকোনমি আইএসডি কল এবং কেবলমাত্র ঢাকা মাল্টি এক্সচেঞ্জ এলাকা হ'তে এনডব্লিউডি কল করা যাবে। এতে ব্যবহারকৃত টেলিফোন নম্বরের বিপরীতে কোন কল চার্জ লাগবে না। শুধু ব্যবহৃত স্ক্যাচ কার্ডের বিপরীতে মূল্যমান কাটা যাবে। এনডব্লিউডি ও আইএসডি সুবিধা নেই এমন ফোনেও এই কার্ডের মাধ্যমে এ সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রাথমিক অবস্থায় ৫০০ ও ২০০ টাকা মূল্যমানের ১৫০ ও ৬০ দিন মেয়াদের কার্ড সারাদেশের সিটি ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকের শাখা থেকে পাওয়া যাবে।

টিএণ্ডটি ল্যাণ্ডফোনের সংযোগ ফি হ্রাস

'বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড' (বিটিটিবি) তাদের ফিক্সড বা ল্যাণ্ডফোনের সংযোগ ফি আরেক দফা কমাল। এর ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের গ্রাহকরা এখন থেকে ৬ হাযার টাকায় ল্যাণ্ডফোন সংযোগ পাবেন। অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই এই নতুন সংযোগ ফি অনুমোদন করেছে। পূর্বে এই সংযোগ ফি ছিল ১০ হাযার টাকা। বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানী ও বেসরকারী ল্যাণ্ডফোন কোম্পানীগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যই বিটিবিবি সংযোগ ফি কমানোর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

বিটিটিবি'র এই নতুন সংযোগ ফি কার্যকর হ'লে যেলাগুলিতে ল্যাণ্ডফোনের সংযোগ ফি ৮ হাযার টাকার পরিবর্তে ৪ হাযার টাকা ও উপযেলা পর্যায়ে সংযোগ ফি ৫ হাযার টাকার পরিবর্তে ২ হাযার ৫শ' টাকা হবে। বিটিটিবি পর্যায়ক্রমে তার টেলিফোনের কলরেট আরো কমাবে বলে জানা গেছে।

বিদেশ

২০ বছর পর জ্ঞান ফিরে পেলেন ওয়ালিস

আমেরিকান টেরি ওয়ালিস (৪২) নামক এক ব্যক্তি গাড়ী দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গত ২০ বছর ধরে কোমায় ছিলেন। দুর্ঘটনায় মাথায় মারাত্মক আঘাত পাওয়ার পর অচেতন অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে তার দিন কাটছিল। সম্প্রতি সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি সচেতন অবস্থায় ফিরে এসেছেন।

ভয়াবহ এই সড়ক দুর্ঘটনার আগের সবকিছু মনে থাকলেও পরের কোন কিছুই তার মনে নেই বলে তিনি তার চিকিৎসকদের জানিয়েছেন। চিকিৎসাবিদরা জানিয়েছেন, তার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কিছু স্নায়ু পুনরায় সচল হয়ে উঠছে, যা সত্যিই বিস্ময়কর। ওয়ালিসের এই নাটকীয় আরোগ্য লাভ আমেরিকার চিকিৎসা জগতে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। গত তিন বছর ধরে ওয়ালিসের অবস্থার একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছিল। সম্প্রতি তিনি কথা বলেন এবং ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত একটানা গুনে সবাইকে অবাক করে দেন।

অন্যের সাহায্য ছাড়া খাওয়া এবং চলাফেরা করতে না পারলেও তিনি এখন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলি আঘাতজনিত বা অন্য কোন কারণে মরে না গেলে তা সাময়িক বিরতির পর পুনরায় সচল ও কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে। তবে এ ধরনের ঘটনা বিরল বলেই তাদের অভিমত।

পোল্যান্ডে শীর্ষ দুই পদে যমজ ভাই

দুই শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালনের এক ব্যতিক্রম ঘটনার জন্ম দিয়েছে দুই পোলিশ যমজ ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট লেচ কাকজিনস্কি সেদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার যমজ ভাই যারোস্লো কাকজিনস্কিকে নিয়োগ দিয়েছেন। সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে কাজিমিরিজ মারকিনকিউকিজ পদত্যাগ করায় এ পদে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই নিয়োগের ফলে বিশ্বের কোন দেশে এই প্রথম শীর্ষ দুই পদে যমজ ভাই দায়িত্ব পালনের ব্যতিক্রম ঘটনার জন্ম দিল।

ফ্রান্সে মুছল্লীর সংখ্যা বাড়ছে

বহু জাতি, ধর্ম ও বর্ণের দেশ ফ্রান্সে ইসলামের দ্রুত প্রসার ও বিস্তার ঘটছে। সেই সাথে কমছে খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাস, প্রেম ও আগ্রহ। ফ্রান্সের জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ খৃষ্টান। তার মধ্যে ৮৮ শতাংশই হ'ল রোমান ক্যাথলিক। এই বিপুল খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর মাত্র এক শতাংশ গীর্জায় গিয়ে নিয়মিত প্রার্থনা করে। প্রতি রবিবার গীর্জায় খৃষ্টানদের সপ্তাহের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা হয়। সেই বৃহত্তম উপাসনার দিন মাত্র সাড়ে চার শতাংশ ফরাসী খৃষ্টান গীর্জায় যায়। বিশেষজ্ঞরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ফ্রান্সে যেসব গীর্জা রয়েছে তার সবগুলির আয়তন যোগ করলে কয়েক লাখ বর্গমিটার জায়গা হবে। দেশব্যাপী বিশাল এলাকা জুড়ে গীর্জা থাকা সত্ত্বেও গীর্জায় প্রার্থনাকারীর সংখ্যা এত দ্রুত কমছে, যা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়।

অপরদিকে মুসলমানদের যত মসজিদ আছে তার সর্বমোট আয়তন হবে মাত্র কয়েক হাযার মিটার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের মসজিদে মুছল্লীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত কল্পনাতীতভাবে বাড়ছে। তারা বলেন, গোটা পশ্চিম ইউরোপে দেড় কোটি মুসলমান রয়েছে। তার মধ্যে ৫০ লাখ মুসলমান ফ্রান্সে বসবাস করে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সে সর্বাধিক মুসলমান রয়েছে। এ সকল মুসলমানরা বেশীর ভাগই বস্তিবাসী, গরীব। সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের অধিকাংশ তুচ্ছ ও ছোট চাকরি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব অবহেলিত ফরাসী মুসলমান তাদের নিজেদের দেশ ও বাপ-দাদার জন্মভূমি হ'তে দূরে থাকা সত্ত্বেও স্বধর্মের প্রতি তাদের বিশ্বাস তিল পরিমাণও কমেনি। ফ্রান্সের শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমানই নিয়মিত মসজিদে যায় ছালাত আদায় করতে। শুক্রবার জুম'আর ছালাতের সময় প্যারিসের আল-ফাআত মসজিদ মুছল্লীদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। তারা মসজিদে শুধু ছালাত আদায় করতেই যায় না। ছালাতের সময় ছাড়াও মুসলমানরা মসজিদে যায় কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে এবং ধর্মীয় বই-পুস্তক অধ্যয়ন ও ইসলাম নিয়ে আলোচনা করতে।

ধূমপান ২১ শতকে কেড়ে নেবে একশ' কোটি প্রাণ

বর্তমান হারে ধূমপান চলতে থাকলে একুশ শতকে সারা বিশ্বে একশ' কোটি লোক মারা যাবে। ধূমপানের কারণে ক্যান্সার ও মৃত্যুর সংখ্যা উন্নত বিশ্বের চেয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেশী বাড়ছে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি এ তথ্য দিয়েছে। ইউএস ক্যান্সার সোসাইটি 'টোবাকো এটলাস' এবং 'ক্যান্সার এটলাস' নামের দু'টি নতুন রেফারেন্স গাইডে এসব তথ্য প্রকাশ করে। এ গাইড থেকে জানা যায়, গত শতকে ১০ কোটি ধূমপায়ী মারা যায় ক্যান্সারজনিত রোগে। এদের মধ্যে অর্ধেকই মারা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। গবেষণায় বলা হয়, ধূমপায়ীদের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে পারলে আগামী ৫০ বছরে ৩০ কোটি মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে। টোবাকো বা তামাক হ'ল একমাত্র ভোগ্যপণ্য, যার কারণে অর্ধেক ভোক্তাই মারা যায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা বিশ্বে ১০০ কোটি পুরুষ এবং ২৫ কোটি নারী ধূমপান করে থাকে।

বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ভানুয়াতু

বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষের দেশ হ'ল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের ভানুয়াতু। সে দেশের জনগণের উপর পরিচালিত এক জরিপের ভিত্তিতে গত ১২ জুলাই লণ্ডনে প্রকাশিত এক গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভে ভানুয়াতুকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুখী মানুষের দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অভিসন্দর্ভটি প্রকাশ করেছে বৃটেনের 'নিউ ইকনমিক্স ফাউণ্ডেশন'। বলা হয়েছে, ভানুয়াতুর পরে সুখী দেশগুলির তালিকায় আছে যথাক্রমে কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, ডোমিনিকা ও পানামা।

জরিপে আরো জানানো হয়েছে যে, বিশ্বের ১৭৮ দেশের মধ্যে সবচেয়ে অসুখী দেশ হ'ল জিম্বাবুয়ে। অসুখী দেশগুলির তালিকায় এরপর নাম এসেছে যথাক্রমে সুয়াজিল্যাণ্ড, বুরুন্ডি, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো ও ইউক্রেন।

খাতনা এইডস রোগ প্রতিরোধে সক্ষম

আফ্রিকায় এইচআইভি রোগ বিস্তার হ্রাস ও মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে পারে খাতনা বা মুসলমানী। এই তথ্য প্রকাশ করেছে পিএলওএস মেডিসিন জার্নাল। ২০০৫ সালে প্রকাশিত এই জার্নালে বলা হয়েছে, মুসলমানী করলে বা খাতনা করা হ'লে এইচআইভি রোগ বিস্তার লাভ করবে না। জার্নালে আরো বলা হয়েছে, এইচআইভি নিবারণের পক্ষে খাতনা আগামী ২০ বছরে আফ্রিকার ছাহারা এলাকায় যে ৬০ লাখ লোকের এইচআইভি রোগে আক্রান্ত হবার প্রচণ্ড সম্ভাবনা রয়েছে এবং ২০ বছরে ৩০ লাখ লোকের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে তা রুখে দিতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকদের মিলিত গবেষণার ফলে যে গবেষণা সন্দর্ভ তৈরী হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, পুরুষের জন্য খাতনা করা একান্তই স্বাস্থ্যসম্মত। খাতনা করার ফলে পুরুষের দেহে এইডস্ জীবাণু প্রবেশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পুরুষদের এই ব্যবস্থা গ্রহণে নারীরাও এইডস্ বিস্তারের হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে গবেষণায় জানানো হয়েছে।

তেলের উচ্চমূল্য বিশ্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

-জি-৮ নেতৃবৃন্দ

জ্বালানির চাহিদা বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে তেলের রেকর্ড পরিমাণ উচ্চমূল্য বিশ্বের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জি-৮ নেতারা। গত ১৬ জুলাই জি-৮ সম্মেলনের কার্যকরী পরিষদের বৈঠকের প্রাক্কালে দেয়া এক বিবৃতিতে নেতারা এ মন্তব্য করেন। নেতারা একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ জ্বালানি বাজার প্রতিষ্ঠায় এবং পরমাণু শক্তিকে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তারও প্রতিশ্রুতি দেন। জি-৮-এর অন্যতম সদস্য রাশিয়া বিশ্ব জ্বালানি বাজার সচল রাখতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেয়। এর একটি হ'ল- উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে জ্বালানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগিতামূলক দামে নিরাপদ উৎস থেকে যথেষ্ট পরিমাণে এবং পরিবেশ বান্ধব উপায়ে তেল সরবরাহ করা আমাদের দেশগুলির জন্য সর্বোপরি মানব সমাজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

উল্লেখ্য, রাশিয়ার বাল্টিক শহর সেন্ট পিটার্সবার্গে বিশ্বের শক্তিধর ৮ জাতি গ্রুপের তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন গত ১৭ জুলাই শেষ হয়েছে। 'হামাস' ও 'হিযবুল্লাহ'র বিরুদ্ধে ইসরাঈলের নগ্ন আগ্রাসনের নিন্দা এবং সেই সঙ্গে ইসরাঈলের আত্মরক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতার অবসান ঘটাবে এই প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাদের শীর্ষ সম্মেলন শেষ করেছেন।

ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার ব্যয় ৪০ হাযার কোটি ডলার

ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাযার কোটি ডলার। যদি ২০০৯ সাল নাগাদ ইরাক থেকে আমেরিকান সব সেনা প্রত্যাহার করে নেয়া হয় তারপরও সব মিলিয়ে ইরাক যুদ্ধের ব্যয় ৬৬ হাযার ৬০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। আমেরিকান কংগ্রেসের বাজেট অফিসের বিশ্লেষণ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সামরিক অভিযান ও সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধসংশ্লিষ্ট খাতে কংগ্রেস সর্বমোট ৫৭ হাযার ৫০০ কোটি ডলার অনুমোদন দিয়েছে।

ট্রেন চলছে পৃথিবীর ছাদের উপর দিয়ে!

চায়নার প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও গত ১ জুলাই বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেলপথ কিংহাই-তিব্বতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। চীন ও তিব্বতের মধ্যে চালু হওয়া নতুন রেল যোগাযোগ দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক উন্নত করার পথ উন্মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন।

কিংহাইয়ের গোলমুদ থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা'র পথে প্রথম ট্রেনটির যাত্রা উদ্বোধন করেন তিনি। ৯০০ যাত্রী নিয়ে ১,১৪২ কিলোমিটার দূরের লামা'র দিকে সকাল ১১-টায় যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। এর কিছুক্ষণ পরই লাসা থেকে আরেকটি ট্রেন যাত্রা শুরু করে গোলমুদের দিকে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যয়বহুল এ রেলপথের মাধ্যমে সমগ্র চায়নার সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল দুর্গম তিব্বত অঞ্চল। হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল আর পৃথিবীর ছাদ হিসাবে পরিচিত পামির মালভূমির ৫,০৭২ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করেছে এ রেলপথ। রেলপথের কোন কোন অংশ

গিয়েছে অত্যন্ত অস্থিতিশীল পারমাফ্রষ্ট বা স্থায়ী বরফের মত মৃত্তিকার উপর দিয়ে। এসব স্থানে ব্রিজের মত উঁচু করে পার করা হয়েছে রেলপথ। বিশেষ ট্রেনও তৈরী করা হয়েছে এ রেলপথের জন্য। কামরাগুলি বিশেষভাবে বায়ু নিরোধক। সমুদ্রপৃষ্ঠের অতি উচ্চতায় যাত্রীরা যাতে অক্সিজেন সংকটে না পড়েন সেজন্য কামরাগুলিতে অক্সিজেন স্প্রে করতে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া সিটের সঙ্গে থাকবে অক্সিজেন মাস্ক এবং প্রতিটি ট্রেনেই থাকবে ডাক্তার ও নার্সের ব্যবস্থা। ট্রেনের জানালার কাচগুলি বিশেষ আল্ট্রাভায়োলেট ফিল্টারযুক্ত, যাতে সূর্যের প্রখর আলো কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে না পারে।

ভ্রাম্যমান চেম্বার!

নিউইয়র্কের ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর বিরক্ত হয়ে বিকল্প চেম্বারের ব্যবস্থা করেছেন নিউ জার্সির এক ডাক্তার। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামে অনেক সময় বসে থাকতে হয় বলেই তিনি নিজের গাড়ির সামনের অংশে ভ্রাম্যমান চেম্বার বানিয়েছেন। নিউজার্সির কেয়ারনির ড. সাফওয়ান সোইডান বলেছেন, তার গাড়ির সামনের দিকে একটি টেবিলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসিয়ে তিনি ভ্রাম্যমান চেম্বারটি বানিয়েছেন। সেখানে টেবিল, কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন এবং ডেস্ক ল্যাম্পসহ প্রয়োজনীয় সবই রয়েছে। তার এ ভ্রাম্যমান অফিসটিকে তিনি নিউইয়র্কের সবচেয়ে স্বল্প মূল্যের অফিস বলে দাবি করেছেন। শহরে গাড়ী নিয়ে চলাফেরা করার সময় ওয়্যারলেস সিগনালের মাধ্যমে তিনি সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন।

মুম্বাইয়ে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণঃ নিহত তিন শতাধিক

ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ে যাত্রীবোঝাই ট্রেনে ও স্টেশনে আটটি সিরিজ বোমা বিস্ফোরণে তিন শতাধিক নিহত এবং প্রায় ৯০০ জন আহত হয়েছে। গত ১১ জুলাই সন্ধ্যা ৬-টার দিকে অফিস ফেরত যাত্রীদের বাড়ী ফেরার সময় পনের মিনিটের মধ্যে ৪টি ট্রেনে ও তিনটি স্টেশনে পরপর এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর মাতুঙ্গা, খার, সান্তাক্রুজ, যোগেশ্বরী, মাহিম ও ভরিবালিতে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে পুরো শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। লণ্ড-ভণ্ড ট্রেনের বগির আশপাশে বিক্ষিপ্ত মানুষের লাশ ও আহতদের আহাজারি এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করে। ঘটনার পরপর মুম্বাই, দিল্লী ও কলকাতাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেড এলার্ট জারি করা হয়। জনাকীর্ণ ট্রেনে ও স্টেশনে এই কাপুরুষোচিত ও ঘৃণ্য হামলার পর বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব থেকে এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও শোক প্রকাশ করা হয়েছে। হামলার ঘটনাকে একটি ঘৃণ্য-সন্ত্রাসী ঘটনা হিসাবে অভিহিত করা হ'লেও ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে বা কোন পক্ষকে এখনো শনাক্ত করা যায়নি এবং কেউ এই বোমা হামলার দায়-দায়িত্বও স্বীকার করেনি।

মুসলিম জাহান

মদীনায় সঊদী আরবের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শহরের উদ্বোধন

সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ পবিত্র নগরী মদীনায় 'নলেজ ইকনোমিক সিটি' (কেইসি) নামের একটি প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন। বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং সম্পদ ও মূলধনের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক নগরী (কেইসি) উদ্বোধন করা হ'ল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটাকে সঊদী আরবের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক প্রকল্প বলা হ'লেও আসলে এটাই এ ধরনের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রকল্প। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দেশের বিখ্যাত তিনটি প্রধান শহরের উপর ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক চাপ কমিয়ে আনতে সঊদী এ্যারাবিয়ান জেনারেল ইনভেষ্টমেন্ট অথরিটির (এসএজিআইএ) উদ্যোগে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এটা গৃহীত প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'লেও সঊদী আরবের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ও প্রসার এবং মদীনাকেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এসএজিআইএ পবিত্র নগরীতে কেইসি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। অত্যাধুনিক এবং উচ্চপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সঊদী আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ও মদীনায় কেইসি স্থাপন পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প তেলসমৃদ্ধ সঊদী আরবে বিদেশী বিনিয়োগ আরো উৎসাহিত করবে বলে এসএজিআইএ জানায়। এটা দেশের বিপুল সম্পদ ও অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এবং মূলধনকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ইন্দোনেশিয়ায় আবার সুনামিঃ নিহত ৬৫০

ইন্দোনেশিয়ার জাভায় গত ১৭ জুলাইয়ের ভয়াবহ সুনামিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫০ জনে। আরো ৩০০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে। এছাড়া ৬ শতাধিক লোক আহত হয়েছে। ৫৪ হাযার লোক বাস্তুহারা হয়েছে। সুনামির আঘাতে জাভার পাংগানদারান এলাকার সমুদ্র তীর এলাকায় ঢেউয়ের পর ঢেউ এলাকার হোটেল ও সমুদ্র তীরবর্তী স্থানসমূহের গাড়ী, মোটর বাইক ও নৌকাগুলিকে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাড়ীঘর ও হোটেলগুলিকে ধ্বংস করে দেয় এবং ধানক্ষেত ও ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাগুলিকে ৫০০ মিটার (৫৫০ গজ) উঁচু পানিতে ডুবিয়ে দেয়। জানা গেছে, গত ১৭ জুলাই স্থানীয় সময় বিকাল ৩-টা ১৯ মিনিটে জাভা দ্বীপপুঞ্জের পাংগানদারান শহরে ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৭। এর উৎপত্তিস্থল ছিল জাভার পশ্চিম উপকূল থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত

মহাসাগরের তলদেশে। জাভার দক্ষিণে সৃষ্ট এই সুনামিতে দুই মিটার উঁচু দেয়ালের মত জলোচ্ছ্বাস সমুদ্র তীরবর্তী ১১০ মাইল এলাকায় আঘাত হানে। যার ফলে এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে গত ২৭ মে একই স্থানে ভূমিকম্পে প্রায় ৫ হাযার ৮০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ২০০৪ সালের সুনামিতে ইন্দোনেশিয়ায় মারা গিয়েছিল প্রায় ১ লাখ ৩০ হাযার মানুষ।

লেবাননে ইসরাঈলের বর্বর আগ্রাসন

লেবাননের 'হিযবুল্লাহ' মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক ২ জন ইসরাঈলী সৈন্য অপহরণের অজুহাতকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া রাষ্ট্রটি সামরিক শক্তিতে সজ্জিত হয়ে লেবাননে ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। ইসরাঈল সন্ত্রাসী কায়দায় মিসাইল হামলা চালিয়ে বৈরুত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েগুলি অচল করে দিয়েছে। যার ফলে লেবানন বিমান কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে বৈরুতগামী সমস্ত বিমানকে সাইপ্রাসে অবতরণ করার নির্দেশ প্রদান করতে। ইসরাঈল অসংখ্য বোমা নিক্ষেপ করে বৈরুতের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের সংযোগকারী সড়কের বিপুলসংখ্যক ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছে এবং দক্ষিণাঞ্চলকেও বৈরুত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এছাড়া বৈরুত থেকে দামেশক অভিমুখী মহাসড়কটি বোমা মেরে যান চলাচলের অনুপযোগী করে দেয়া হয়েছে। বেপরোয়া বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে লেবাননকে আকাশ, নৌ এবং সড়কপথে পুরোপুরি অবরুদ্ধ রেখে আগ্রাসী ইসরাঈল দেশটির উপর ধ্বংসাত্মক বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে।

ইসরাঈলী বিমান গত ১৫ জুলাই লেবাননের সিরিয়াপন্থী পার্লামেন্ট স্পীকার নাবিহ বেরির বাসভবনেও বোমাবর্ষণ করেছে। এতে স্পীকারের বাসভবনের ব্যাপক ক্ষতি হ'লেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এছাড়া ইসরাঈলী বিমান হামলায় বৈরুতস্থ হিযবুল্লাহ মুজাহিদদের ৯তলা প্রধান কার্যালয় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। লেবাননের সড়কপথের সংযোগ রক্ষাকারী ব্রীজ-কালভার্ট এবং তেল সংরক্ষণাগার ও পেট্রোল পাম্প, এমনকি হাসপাতালগুলিও ইসরাঈলী বিমান হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

এদিকে ইসরাঈলী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাযার হাযার লেবাননী ইতিমধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ইসরাঈলের হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে আরো হাযার হাযার লোক প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী দেশগুলোয় যাচ্ছে। সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে ইসরাঈল লেবাননের শহর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প কারখানা, বিমানবন্দর, সড়ক, রেলপথ, ব্যবসা কেন্দ্র, সরকারী-বেসরকারী অফিস, ভবন ও দালান সহ সব ধরনের অবকাঠামো ধ্বংস করে চলেছে। আগ্রাসনের পাশাপাশি ইসরাঈল সমুদ্র, নৌ এবং আকাশপথে অবরোধ আরোপ করেছে। যার ফলে বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রয়েছে দেশটি। এ পরিস্থিতিতে লেবাননে খাদ্য এবং ওষুধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। হামলায় রাজধানী বৈরুতসহ বেশীরভাগ শহরেরই বাড়ীঘর এবং হাসপাতাল ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরাঈলী বিমানের অনবরত বোমাবর্ষণে অধিকাংশ হাসপাতাল ও ক্লিনিক বিধ্বস্ত হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য কোন চিকিৎসা কেন্দ্র অথবা ভবন অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে না। অবশিষ্ট যে দু'একটা হাসপাতাল খোলা রাখা হয়েছে আহতদের যরূরী চিকিৎসা দেয়ার জন্য অনেক ডাক্তার এবং নার্স প্রাণের ভয়ে সেগুলি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছেন। ডাক্তাররা হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অন্যত্র চলে যাওয়ায় নারী, শিশু এবং বৃদ্ধসহ গুরুতর আহতদের যরূরী চিকিৎসা ও সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিনা চিকিৎসায়ও অনেকে মারা যাচ্ছে। এভাবে প্রতিনিয়ত ইসরাঈলী আক্রমণে লেবানন এখন বিভীষিকাময় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশ

ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও বর্তমান প্রজন্মকে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক্স অব বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গত মার্চ '০৬-এ দেশব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতার ১ম গ্রুপে দাখিল, এসএসসি ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ছিল 'ইসলামী ব্যাংকিংঃ পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী'। এতে ১ম, ২য় ও ৩য় হয়েছেন যথাক্রমে এ.বি.এম. জাহীদুল হক, হাজী আহমাদ আলী আলিয়া মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ, আজমাল হোসেন মেমন, রাইফেলস পাবলিক স্কুল, আখালিয়া, সিলেট এবং মোসাঃ রুনা খাতুন, মাদারগঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, গোপীগ্রাম, পীরগঞ্জ, রংপুর।

২য় গ্রুপে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ছিল 'ইসলামী ব্যাংকিং ও কনভেনশনাল ব্যাংকিংঃ তুলনামূলক পর্যালোচনা'। এতে ১ম, ২য় ও ৩য় হয়েছেন যথাক্রমে মোঃ সাইদুল হক, অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, মুহাম্মদ মুস্তফা সাদেক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

৩য় গ্রুপ সকল বয়স ও পেশার জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিষয় ছিল 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা'। এতে ১ম, ২য় ও ৩য় হয়েছেন যথাক্রমে রাহমাতুল্লাহ খন্দকার, সিনিয়র অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, শরীয়াহ্ কাউন্সিল, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, প্রধান মুহাদ্দিস, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর এবং মুহাম্মদ আতাউল হক সিরাজী, সিনিয়র অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পাহাড়তলী শাখা, চট্টগ্রাম।

এই রচনা প্রতিযোগিতার প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী পুরস্কার হিসেবে সার্টিফিকেটসহ পাবেন যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকার নগদ সম্মানী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্রথম ব্যাটারি চালিত বিমান

বিশ্বের প্রথম ব্যাটারি চালিত বিমান আবিষ্কার করেছে জাপানের 'টোকিও ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি'র ছাত্ররা। মনুষ্যবাহী সাধারণ ড্রাইসেল ব্যাটারি চালিত এই বিমানটি মাটি থেকে ৫ মিটার উঁচুতে উড়তে সক্ষম। এক আসন বিশিষ্ট গ্লাইডারের মত দেখতে বিমানটির এক পাখা থেকে অন্য পাখা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৩১ মিটার এবং ওযন একশ' কিলোগ্রাম। হোন্ডা মোটর কোম্পানীর নিজস্ব বিমানবন্দর থেকে ১৬ জুলাই বিমানটি ৫ দশমিক ২ মিটার উপরে উঠে ৫৯ সেকেণ্ড আকাশে উড়ে।

বার্ড ফ্লু ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে ভারত

বার্ড ফ্লু ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার দাবি করেছে ইনডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ কাউন্সিল (আইসিএআর)। ভূপালে এ্যানিমাল ডিজিজ ল্যাবরেটরীতে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় মাত্র চার মাসের গবেষণায় এ সাফল্য অর্জন করেন গবেষকরা। এ বছর ফেব্রুয়ারীতে ইনডিয়ায় মুরগির দেহে বার্ড ফ্লু ধরা পড়ার পর প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে লাখ লাখ মুরগি মেরে ফেলা হয়। এখনো ইনডিয়ায় কোন মানুষের দেহে এ রোগের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। তবে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। কারো শরীরে ফ্লু'র উপসর্গ দেখা দিলেই নানাভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তবে মুরগির দেহে ভাইরাস দেখা দেয়ায় বিভিন্ন সরকারী অফিসসহ অনেক লোক হাঁস-মুরগি ও ডিম খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষ বারবার বলেছেন, রান্না করা গোশত বা ডিমে ভাইরাস থাকে না।

এইডস্ প্রতিরোধে টমেটো ভ্যাকসিন

গবেষকরা এ পর্যন্ত প্রায় ৯০টি এইডস্ প্রতিরোধমূলক ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু এগুলির কোনটিই এইডস্ নির্মূলে পুরোপুরি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। সম্প্রতি রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা মুখে সেবনযোগ্য নতুন একটি ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের ঘোষণা দিয়েছেন। জিনগতভাবে পরিবর্তিত এক ধরনের টমেটো থেকে তৈরী এ ভ্যাকসিন ইঁদুরের দেহে এইডসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। গত জুন মাসে লিসবনে 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ইনফেকশাস ডিজিজেস'-এর সম্মেলনে এ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নতুন এ ভ্যাকসিনটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী দু'টি ভাইরাস প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। এর একটি হচ্ছে এইচআইভি। এইচআইভি'র সংক্রমণেই এইডস্ রোগ হয়। এ ভাইরাস রক্তের 'টি' সেলকে ধ্বংস করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে দেহে বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং জীবাণু দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হ'তে পারে। এইচআইভি সংক্রমণের ফলে ক্যান্সার, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, দৈহিক ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি এক সময় মারা যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন ভ্যাকসিনটি এ ভয়ংকর ভাইরাসটির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। এছাড়াও হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (এইচবিভি) প্রতিরোধেও এটি কার্যকর হবে। যদিও এইচবিভি ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই বাজারে এসেছে। কিন্তু এর দাম বেশী হওয়ায় সবার পক্ষে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

রাশিয়ার আরকুতস্ক-এর 'সাইবেরিয়ান ইন্সটিটিউট অফ প্ল্যান্ট ফিজিওলজি এ্যান্ড বায়োকেমিষ্ট্রি'র গবেষক রুবিক সালাইয়েভ জানান, তারা প্রথমে এগ্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউমফেসিয়েন্স নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে এইচআইভি এবং এইচবিভি ভাইরাসের ডিএনএ'র একটি সিনথেটিক কম্বিনেশন টমেটো গাছে প্রবেশ করান। এদের মধ্যে এইচআইভি এবং এইচবিভি প্রোটিন তৈরীর জন্য কিছু জিনের অংশবিশেষও ছিল। এ গাছের টমেটো যখন খাওয়া হয় তখন এর প্রোটিন শরীরের ভাইরাসগুলির বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরী করে।

এ টমেটো ইঁদুরকে খাইয়ে দেখা গেছে, ইঁদুরের রক্তের এইচআইভি এবং এইচবিভি বিরোধী এন্টিবডির মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অন্তঃত্বকের বহির্ভাগেও এন্টিবডির উপস্থিতি বেড়ে যায়। মূলতঃ এসব জায়গা দিয়েই এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে থাকে।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টমেটো ভিত্তিক এ ভ্যাকসিনটি ট্যাবলেটের আকারে বাজারে পাওয়া যাবে। এ ভ্যাকসিনকে হিমাগারে রাখতে হবে না বা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে ঢোকাতে হবে না। এটাই এ ভ্যাকসিনের বড় সুবিধা। তাছাড়া ভ্যাকসিনটির দামও পড়বে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দরিদ্র দেশগুলিতেও এটি সহজলভ্য হবে।

কিডনী ক্যান্সারের নতুন ওষুধ

চিকিৎসকদের একটি দল গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মার্কিন ওষুধ কোম্পানীর তৈরী দু'টি নতুন ওষুধ কিডনীতে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর আয়ু বাড়াতে এবং টিউমার বড় হওয়া রোধে কার্যকরী। ফাইজার কোম্পানীর বাজারজাতকৃত ওষুধ 'সুটেন্ট' গড়ে ১১ মাস সময় পর্যন্ত কিডনী ক্যান্সার প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে প্রচলিত ওষুধের এবং কিডনী ক্যান্সার প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল ৫ মাস। সুটেন্ট প্রয়োগে টিউমারের আকার বৃদ্ধিও রোধ করা সম্ভব হয়েছে। প্রচলিত ওষুধ প্রয়োগে যা সুফল পাওয়া যেত এই ওষুধ প্রয়োগে তার তুলনায় ৫ শতাংশ বেশী সুফল পাওয়া গেছে। জর্জিয়ার আটলান্টায় 'আমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল অংকোলজি' থেকে এই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুটেন্ট-এর জেনেরিক নাম হচ্ছে সুনটিনিব। ওয়াইথ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরী টেমসিরোলিমাস নামক একটি ওষুধও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ভাল ফল দিয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

অন্যায় কারানির্যাতন থেকে কেন্দ্রীয় তিন নেতার মুক্তি লাভ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ যুলুমশাহীর প্রায় দেড় বছরের নির্মম কারানির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। জঙ্গীবাদের ডাহা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত মধ্যরাতে রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ বাসা ও দারুল ইমারত থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর দায়ের করা হয় খুন, ডাকাতী, বোমাবাজি সহ জঘন্য মিথ্যা ও সাজানো মামলা। গত ৯ জুলাই রবিবার বিকাল ৫-টায় নওগাঁ যেলা কারাগার থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা সহ দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত শত শত নেতা-কর্মী কারাগারের সদর দরজায় তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময়ে কর্মীদের 'আহলেহাদীছ আন্দোলন জিন্দাবাদ', 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ জিন্দাবাদ', 'তিন নেতার মুক্তিতে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা' প্রভৃতি শ্লোগানে কারাগার চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। অতঃপর ২৫টি মাইক্রোবাস, ৩০/৩৫টি মটর সাইকেল ও বাসের বিশাল বহর মুক্তিপ্রাপ্ত তিন নেতাকে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে আসে। এ সময় তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, মাসিক আত-তাহরকী সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ ও মাদরাসার ছাত্রবৃন্দ। নওদাপাড়া মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন মাষ্টার এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ্যাডভোকেট মফীযুদ্দীন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবৃন্দ নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছলে তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আশ-পাশের লোকজন ছুটে আসে। ফলে নওদাপাড়া মারকায এক নারণ্যে পরিণত হয়।

অতঃপর বাদ মাগরিব তাঁদের সম্মানে প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বক্তব্য রাখেন সদ্য কারামুক্ত মযলূম নেতা 'আন্দোলন'-এর সিনিয়ার নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি' সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ সাড়ে ১৬ মাস যাবত হয়রানি করা হয়েছে। আন্দোলন বিদ্বেষী একটি মহল ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার চালিয়ে এবং সরকারকে ভুল বুঝিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে আরোপিত সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় সরকার তাঁদেরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তারা এই অন্যায় হয়রানীর তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা জানান চক্রান্তকারীদের শাস্তি দাবী করেন। তিন নেতার মুক্তিতে বক্তাগণ আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন এবং অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মুক্তির জোর দাবী জানান।

আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনাঃ

১৪ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সদ্য কারামুক্ত নেতৃবৃন্দের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর সদ্য কারামুক্ত সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, অর্থ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সদ্য কারামুক্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা যুবায়ের আহমাদ, 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা অভিযোগে মাসের পর মাস কারাবন্দী রেখে এই সরকার

জাতির সাথে জঘন্য প্রতারণা করেছে। জাতির নিকটে তাদেরকে ক্ষমা চাইতে হবে, নচেৎ আলেম নির্যাতনের অপরাধে যালেমদের উপরে এলাহী গযব নেমে আসতে বাধ্য। তাঁরা বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি সংস্কারবাদী আন্দোলন। আল্লাহ প্রেরিত অহি-র আলোকে সমাজ সংস্কারই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই আন্দোলন কোন প্রকার চরমপন্থাকে সমর্থন করে না। নেতৃবৃন্দ আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নিয়ে সকল ষড়যন্ত্র বন্ধের এবং অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে মুক্তিদানের জোর দাবী জানান। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মী উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য, কারামুক্ত তিন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন যেলায় মোট ৬টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সব ক'টি মামলা থেকে তাঁরা নিঃশর্ত মুক্তি পেয়েছেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

ভারপ্রাপ্ত আমীরঃ

১৩ জুলাই'০৬ অনুষ্ঠিত 'মজলিসে শূরা'-র সিদ্ধান্তক্রমে করামুক্ত সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর মনোনীত করা হয়েছে।

খুলনায় তিন নেতার সংবর্ধনা

২৩ জুলাই রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে নগরীর খানজাহান আলী রোডস্থ সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিন নেতার কারামুক্তি উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর সদ্য কারামুক্ত সিনিয়র নায়েবে আমীর (বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আমীর) শায়েখ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন প্রমুখ।

দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৩০ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ টি,এন্ড,টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাতি মাওলানা আবু হানীফ। যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক কর্মী উক্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করেন।

আদিতমারী, লালমণিরহাট ২০ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ শুরু হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের ও 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান। অতঃপর ২১ জুলাই শুক্রবার সকাল ১০-টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পীরগাছা, রংপুর ২১ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর ও কুড়িগ্রাম যেলার যৌথ উদ্যোগে রংপুর যেলার পীরগাছা থানাধীন বড়চওড়া সালাফিয়া হাফিযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে ২ দিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ সেকেন্দার আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবু বকর।

নীলফামারী, ২২ জুলাই রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার যৌথ উদ্যোগে নীলফামারীর আলশীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয়

প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক তাবলীগ সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর বর্তমান অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুস সাত্তার।

নাটোর, ২৮ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে স্থানীয় শুকোলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর (বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আমীর) শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও শুকোলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা গোলাম আযম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী জনাব আনোয়ারুল হক, নাটোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী প্রমুখ। প্রশিক্ষণে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও কুরআন তেলাওয়াত করে সাজেদুর রহমান।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

বগুড়া, ১১ জুলাই মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম মিন্টু চেয়ারম্যান-এর বাসভবনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সদ্য কারামুক্ত সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল মালেক ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির জোর দাবী জানান।

যুবসংঘ

শরীফপুর, গাযীপুর ৩০ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা আকমাল হোসাইন বিন বদীউয্যামান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছাদ্দেক হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অহি ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোন বিকল্প নেই। 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কাজ করে যাচ্ছে। মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণে ও সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুযায়ী দেশপ্রেমিক আদর্শবান কর্মী ও সুনাগরিক তৈরীর পাশাপাশি প্রকৃত মুমিন হিসাবে প্রত্যেক মুসলমানকে গড়ে তুলতে এ সংগঠন বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। তিনি 'যুবসংঘে'র এই তাওহীদী কাফেলায় শরীক হয়ে দ্বীনে হক্ব প্রচারে সর্বাত্মক ব্রতী হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২৮ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল সোয়া ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস প্রমুখ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন দায়িত্বশীল এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার আহমাদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক কর্মী যোগদান করেন।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

চাই এক স্থিতিশীল পৃথিবী

সাত মহাদেশের তাবৎ মানুষের মানবিক প্রত্যাশা হ'ল শান্তি ও স্থিতিশীলতা। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও আদর্শভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও শান্তি সব মানুষের কাম্য। কিন্তু কতিপয় সমাজ বিধ্বংসী মানব কীটের ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠার কারণে পৃথিবী ক্রমশঃ মানবতাহীন ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। বিশ্বযুদ্ধ আর মহাযুদ্ধের হত্যাযজ্ঞে বিশ্বমানবতা দিশেহারা। একটি যুদ্ধ শেষ না হ'তেই যুদ্ধবাজরা পৃথিবীর অপর কোন স্থানে বাঁধিয়ে দেয় আরেকটি যুদ্ধ। রক্তের হুলি খেলায় রঞ্জিত হয় এই সুখ-সমৃদ্ধ বসুন্ধরা। আফগানিস্তানের পর ইরাকের উপর যে বর্বরতা নেমে আসে, তার বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকা থেকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ইরাকে নিহত এক আমেরিকান সেনা সদস্যের প্রতিবাদী মা 'শিন্ডি শিহানে'র প্রতিবাদের ভাষা ছিল 'নিহতের সংখ্যা ২২৪৫, আর কত?' এতে তার স্বার্থপরতা লক্ষ্য করা যায় দিব্যি। আমেরিকান সেনাদের কথা তার মুখে আসলেও ভ্রমেও ইরাকের ভাগ্যাহত মানুষগুলোর কথা কখনোই মুখে আসেনি। অপরদিকে ফিলিস্তীন ও লেবাননে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে তা সর্বকালের বর্বরতার ইতিহাসকে যেন হার মানিয়েছে। মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম এই দু'টি দেশকে। মধ্যপ্রাচ্যের দুঃখ, জারজ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল তার পশ্চিমা প্রভুদের ইঙ্গিতেই এসব লোমহর্ষক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে একের পর এক জনপদ নিশ্চিহ্ন করে চলেছে। অসহায় শিশুরাও এদের হিংস্রতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সন্তান হারা মায়ের করুণ আর্তনাদ এবং অবুঝ শিশুর গগণবিদারী চিৎকার বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কর্ণও স্পর্শ করছে না। সর্বাত্মক মানবিক বিপর্যয় চলছে সেখানে। 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' শ্লোগানধারীরা মনে হয় হাফিয়ে উঠেছে। মতলববাজদের ইশারায় এই শ্লোগান ক্রমশঃই যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আমি অস্থির হয়ে উঠি, যখন দেখি রক্তে কেনা এই স্বাধীন দেশের উপর বোমাবাজ অপশক্তির হিংস্র নখর। যখন দেখি এদেশের মুক্তমনা ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ফেলে অশুভ শক্তির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বাস্তবতার দিকে এগিয়ে চলে। এই বোমাসরঞ্জাম আর বাংলা ভাইদের উত্থান কাহিনী এখনো রহস্যমুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত ভাষা হিসাবে বাংলা একজন সন্ত্রাসীর নামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে- এটা এদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে আমার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। মানবতার উপর বাংলা ভাইদের পাশবিক আচরণে অক্ষত থাকেনি এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল এই বোমা সংস্কৃতির দূরদর্শী প্রভাব নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। বিবেকবর্জিত এই অপকর্মের দায়ভার এদেশের সরলপ্রাণ জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে কখন জানি দেশটিকেই ক্ষত-বিক্ষত করা হয়, সে আশংকায় আমরা অত্যন্ত আতঙ্কিত। পত্রিকান্তরে দেখা যায়, যারা ক্রীড়নক হিসাবে মাঠে কাজ করছে তাদের পরিচয়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বড়দাদা এবং জঙ্গীবাদের পৃষ্ঠপোষক মহলটির মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র আছে। এরা সবাই একই পন্থী। অথচ দেশপ্রেমিক আলেম সমাজকে করা হচ্ছে প্রশ্নের মুখোমুখি। আকার-ইঙ্গিতে অনেক কিছুই বোঝা যায়। যতক্ষণ বিশ্ব বিবেকের মধ্যে সত্যোপলব্ধি না আসবে, ততক্ষণ শান্তির জন্য সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে। আমরা হয়ত তাদের নাস্তানাবুদ করতে পারব না। কিন্তু তাদের বিবেকতন্ত্রীতে আঘাত তো করতে পারব।

পৃথিবীতে শতভাগ শান্তি হয়তো আসবে না, কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষামূলক ও বিনোদনগত দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ একটি পরিবেশ চাই। যেখানে আর যাই হোক অন্ততঃ আবু গারিবের উপস্থিতি থাকবে না। বিন লাদেনের অজুহাতে নিহত হবে না লক্ষ লক্ষ আফগান। আর স্থায়ী যুদ্ধের বন্দোবস্তে সৃষ্টি করা হবে না ইসরাঈল, কাশ্মীরসহ রক্তে রঞ্জিত জনপদ সমূহ।

মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ
পিজিডি ইন সিভিক জার্নালিজম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সত্য-মিথ্যা পরিমাপক যন্ত্র চাই!

ছোট বেলায় শুনেছি মানুষ কেবল 'রূহ' জীবন তৈরী করতে পারে না, তাছাড়া মানুষের অসাধ্য বলে কিছু নেই। বাস্তবেও তাই দেখি। কিছুদিন আগে মনে করতাম, মানুষের আবিষ্কার করার মত আর কিছু নেই। মানুষ অতি দ্রুত গতি সম্পন্ন নভোযান আবিষ্কার করে চন্দ্র হ'তে শুরু করে স্বশরীরে মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এরপর আর আবিষ্কার করার মত বস্তু নেই বলেই মনে করতাম। ইদানীং মানুষকে বিস্মিত করে আবিষ্কৃত হয়েছে কম্পিউটার। আবিষ্কৃত হয়েছে ইন্টারনেট। নিমিষে বিশ্বের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বিনিময়ের সাথে সাথে দেখা-সাক্ষাৎও সংঘটিত হচ্ছে ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে। মূলতঃ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ শক্তি। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের বিকাশ সাধনে মানুষ এতকিছু বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কার করেছে। মানুষ হয়ত জ্ঞান সাধনার দ্বারা আরো কিছু বিস্ময়কর তথ্য ও বস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে।

মিথ্যা মামলা ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কারণে জগতে অগণিত মানুষ কল্পনাতীত দুর্ভোগের শিকার হয়ে থাকে। আমি অতি আন্তরিকভাবে জগতের সেরা সেরা আবিষ্কারকদের প্রতি একটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্য আবেদন রাখছি, যে যন্ত্রের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা নিরুপিত হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য দানের উপর নির্ভর করেই বিচারককে রায় দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়ে থাকে। কঠিন কঠিন অংকের ফল যখন ক্ষুদ্র ক্যালকুলেটর যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব, তখন আমার আবেদনকৃত যন্ত্রটিও আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। আর এটি যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে জগত হ'তে মিথ্যাচার অনেকাংশেই দূরীভূত হবে এবং মানুষ মিথ্যা চক্রান্তের বেড়াজালে পড়ে দুর্ভোগের শিকার হওয়া থেকে মুক্তি লাভ করবে। নিরপরাধ ও নির্দোষ ব্যক্তিগণ পাবেন মুক্তি। জগতে ফিরে আসবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাস বাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

শিক্ষকের অবমাননা জাতির জন্য হুমকি স্বরূপ

শেকড় ছাড়া যেমন কোন গাছ বেঁচে থাকতে পারে না। তেমনি সবারই জানা কথা যে শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার অবস্থাটা কেমন হবে। শিক্ষক হচ্ছে একটা জাতির কর্ণধার, যোগ্য সুনাগরিক গড়ে তোলার মোক্ষম হাতিয়ার। ভাল শিক্ষক ছাড়া যেমন ভাল শিক্ষাদান সম্ভব নয়, তেমনি শিক্ষকের মৌলিক অধিকার পূরণ ব্যতিরেকে একটা জাতির সত্যিকার সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রাও অসম্ভব। এটা করা এক প্রকার বাতুলতা ভিন্ন কিছু নয়। আর এই জাতির কর্ণধারদেরকে যদি তাঁদের মৌলিক দাবী আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে ঢাকার রাজপথে সানকি হাতে কাফনের কাপড় পরিহিত অবস্থায় মিছিল সমাবেশ করতে হয় তখন দেশের শিক্ষার যে কেমন বেহাল অবস্থা দাঁড়ায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের জন্য এর চাইতে লজ্জাজনক আর কিছু হ'তে পারে কি? তাঁরা যখন তাদের মৌলিক দাবী আদায়ের নিমিত্তে রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছেন তখন কর্তৃপক্ষ চোখে অন্ধত্বের চশমা পরে অন্ধ সেজে বসে থাকছে। আর নিজ নিজ আসন সুরক্ষায় তারা অধিক সোচ্চার। যেন নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে বসেছে। তারা সুনাগরিকের কাছে কেমন প্রতিদান আশা করবেন? আর নিজের বিবেকের কাছেই বা কেমন প্রতিদান আশা করবেন?

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার না হওয়া কেমন আইন? এছাড়া আরেকজন শিক্ষাবিদকে মিথ্যা অভিযোগে মাসের পর মাস কারাবন্দী রাখা কেমন নৈতিকতা? এসবের হিসাব কে দেবে? দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝুলছে তালা। রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভিসিকে হত্যার হুমকি, ভাংচুর এগুলো কিসের আলামত? তাছাড়া অনেক বিদ্যালয়ে ঠিকমত ক্লাস হয় না, শিক্ষকদের বেতন ভাতা বন্ধ। এসব দেখার দায়িত্ব কার? দায়িত্ব প্রাপ্তরা তাদের দায়িত্ব ভুলে গেলে সেই ভুলের মাশুল কিন্তু তাদেরকেই দিতে হবে। দেশের অর্থনীতিতে সবচাইতে লাভজনক গার্মেন্টস্ শিল্পে আজ কেন অস্থিরতা বিরাজ করছে? শিল্প কারখানার জন্য কেন জোরালো কোন নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে না? এতে কাদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে? শিল্পকারখানা ধ্বংস করে কারা এদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে চাইছে? এর সঠিক রহস্য উদঘাটন করার দায়িত্ব কার? কেনইবা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এত বাধা? এসবের উত্তর কি? তাই সকলে যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে নিষ্ঠার সাথে এবং নিরপেক্ষভাবে পালন করে তবে একটা জাতি নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া এখন সময়ের অনিবার্য দাবী।

মুহাম্মাদ আবু কাওছার
রাজশাহী কলেজ।

মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২০০৭ সালের হজ্জ প্যাকেজ-এর বুকিং চলছে

মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সফলভাবে হজ্জ পালনকারীদের নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটধারী আলেমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ পালনে ইচ্ছুকদের জন্য **মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ** একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আমরা বাংলাদেশ থেকে শুরু করে মক্কা, মদীনায় সফর ও অবস্থানকালীন সময়ে আমাদের অভিজ্ঞ প্রতিনিধির সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে স্বল্প খরচে ও আকর্ষণীয় প্যাকেজের মাধ্যমে হজ্জ পালন করিয়ে থাকি।

যারা ২০০৭ সালে হজ্জ পালন করার নিয়ত করেছেন তারা **মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ** এর সাথে যোগাযোগ করে বিশুদ্ধভাবে সালাফী মতে হজ্জ করার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিন। এজন্য হজ্জের নিয়ম-কানূন ও বিস্তারিত ফিকহী মাসআলা সম্বলিত বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য **'ছহীহ হজ্জ উমরাহ্ ও যিয়ারত নির্দেশিকা'** বইখানি সংগ্রহ করে ভালভাবে অধ্যয়ন করুন। কেননা হজ্জ একটি ব্যয়বহুল ইবাদত, যা মানুষের জন্য জীবনে একবারই ফরয। হাদীছে এসেছে اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ **'কবুল হজ্জের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত'**। তাই এই ইবাদত পালন করার জন্য ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।

মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১১১৮০৬৪০।

আলহাজ্জ আব্দুছ ছবুর (গাযীপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১২৫২৪৪৬১।

আলহাজ্জ গোলাম মওলা (গাযীপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১১৬৬৯৭৬১।

আলহাজ্জ ওয়ালীউল্লাহ
বংশাল, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১১৬৪৬৩৯৬।

মোফাক্কার হোসেন
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

আলহাজ্জ নূরুল ইসলাম প্রধান
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
মোবাইলঃ ০১১৯৭০৪১৪৫০।

মাওলানা মাসুদুর রহমান (জামালপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১৯৬৯২৬২১।

আলহাজ্জ আব্দুল হালীম (খুলনা)
ফোনঃ ৮১১৩৯৫ (সকাল ৯টা-রাত ৯টা)।
৮০০২৭২ (বাসা)।

মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ
গোল্ডেন প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা)
প্লট নং-৩৪, রোড নং ৪৬, গুলশান-২
(গোল চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণারে), ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮২১৯৫০; ৮৮১৯০৫২

সার্বিক যোগাযোগ
আলহাজ্জ আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ
মোবাইলঃ ০১৭১৬-৩২৯৯২১; ০১৫২৪১২১৮৭
আলহাজ্জ আকমাল হোসাইন (নারায়ণগঞ্জ)
মোবাইল ঃ ০১৫২৪৫৯৫৮৩
আলহাজ্জ আকরামুজ্জামানঃ ফোনঃ (০২)
৮৯২০৯৩৫; মোবাইলঃ ০১৮৭১২৯৮০৭

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক সন্তান প্রসবকারিণী মহিলাকে বিবাহ করতে বলেছেন। কিন্তু অধিক সন্তান গ্রহণের কারণে অনেককে দেখা যায় যে, সন্তানের ভরণপোষণ দিতে পারে না এবং প্রকৃত হক্বও আদায় করতে পারে না। অনেক কষ্টে তাদেরকে জীবন যাপন করতে হয়, এর কারণ কি?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বেশী সন্তান নিলে অভাব-অনটনে পড়বে এরূপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে সন্তানদের ভরণ-পোষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের রূযীর একটা পথ বের করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দিবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করবেন, যার সে ধারণাও করতে পারে না' *(ত্বালাক্ব ২-৩)*। অনুরূপ সন্তানদেরকে খাদ্য দেওয়ার ভয়ে হত্যা করাও মহা অন্যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে খাদ্য প্রদানের ভয়ে হত্যা করো না' *(বণী ইসরাঈল ৩১)*। সুতরাং অধিক সন্তান প্রসবকারিণী মহিলাকে বিবাহ করাই শরী'আত সম্মত। আর এতেই বরকত রয়েছে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত, হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ 'মাযহাব' শব্দটি কোন ভাষার, এর অর্থ কি? মাযহাব না মানলে কি কাফের হয়ে যাবে? মাযহাবের সংখ্যা কত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল গফুর
হরিণা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মাযহাব' আরবী শব্দ। এর অর্থ চলার পথ। শরী'আতে 'মাযহাব' একটিই। সেটা হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের পথ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ *(আন'আম ১৫৩; আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৬৬ ও ১৬৫, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া দ্বিতীয় কোন মাযহাব নেই। যে সমস্ত মাযহাব মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে তার সবই স্বর্ণ যুগের বহু পরে সৃষ্ট। যেমন- শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'র মধ্যে লিখেছেন, '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না' *(ঐ, ১/১৫২-৫৩, 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। মাযহাব না মানলে কেউ কাফের হবে না, বরং এ সমস্ত মাযহাব মানাই শরী'আত পরীপন্থী। মুসলমান মাত্রই স্বাধীনভাবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করবে। এছাড়া কোন মাযহাব বা তন্ত্রের অনুসরণ করতে পারে না। যেমন ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বের কোন মানুষ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। প্রসিদ্ধ মাযহাব ৪টি। তবে আরও অসংখ্য মাযহাব রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ জুম'আর দিন বা অন্য দিনে গোসল করার হুকুম কি? কেউ কেউ বলেন, জুম'আ বা ঈদের দিনের মুস্তাহাব গোসল ঐ দিনের সূর্যোদয়ের পরে করতে হবে। কেউ যদি বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাত্রে ফজরের পূর্বে গোসল করে তাহ'লে জুম'আর মুস্তাহাব গোসল আদায়ের জন্য সূর্যোদয়ের পর তাকে কি আবার গোসল করতে হবে?

-আব্দুর রহমান
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ জুম'আর দিনে গোসল করা সুন্নাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮)*। ফজরের পূর্বের গোসল জুম'আ বা ঈদের দিনের সুন্নাত গোসল হিসাবে গণ্য হবে না। জুম'আর মুস্তাহাব গোসলের জন্য তাকে পুনরায় ছুবহে ছাদিক বা সূর্যোদয়ের পরে গোসল করতে হবে। কারণ শারঈ পরিভাষায় দিন হ'ল ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬০)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ মহিলাদেরকে পুরুষদের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে জনশ্রুতি আছে। তাহ'লে যে নারীর কয়েকজন পুরুষের সাথে বিবাহ হয়, তাকে কোন পুরুষের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?

-আনীস
তুলাগাঁও, দেবিদ্বার
কুমিল্লা।

উত্তরঃ আদম (আঃ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে একথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪৫৮; বিদায়া ১/১৭৩ পৃঃ; ফৎহুল বারী ৯/৩১৫ হা/৫১৮৬-এর ব্যাখ্যা)*। কিন্তু পরবর্তী সকল নারীকে তাদের স্বামী বা পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে একথা ভিত্তিহীন। এর কোন শারঈ দলীল নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ বিবাহে যৌতুক নেওয়া হারাম। তবে কনের পিতা খুশি মনে কিছু দিলে তা যৌতুক বলে গণ্য হবে কি? কৌশল করে কনের পিতার নিকট থেকে কিছু নেওয়া কি বৈধ হবে?

-দুলাল মিয়াঁ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি কনের পরিবারের উপর মারাত্মক যুলুম। শরী'আতে যা সম্পূর্ণ হারাম। কনের পিতার কাছ থেকে কৌশল করে কিছু গ্রহণ করলে তা হবে ধোঁকাবাজী। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০)*। জানা আবশ্যক যে, বরের পক্ষ থেকে কনেকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহর প্রদান করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা রমণীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহর প্রদান কর' *(নিসা ৪)*। তবে কনের পিতা যদি স্বেচ্ছায় জামাইকে কিছু দেয় তাহ'লে সেটি যৌতুক হবে না। অনুরূপভাবে জামাই কৌশল করে কিছু গ্রহণ করলেও তা জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ কুরআন মজীদে অঙ্কিত আয়াতের চিহ্ন বা ওয়াক্ফগুলি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, না ছাহাবীগণের ইজতিহাদ?

-আরীফা
ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কুরআন মজীদের আয়াতের চিহ্ন বা ওয়াক্ফগুলি সম্পূর্ণ তাওক্বীফী অর্থাৎ সরাসরি জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নাযিলকৃত। এগুলি ছাহাবীগণের ইজতিহাদ নয় *(তাফসীরে কুরতুবী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪; আল-ফুতূহাতুল ইলাহিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ যোহরের সুন্নাত আদায় করা অবস্থায় জামা'আত শুরু হ'লে সুন্নাত ছেড়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হয়। কিন্তু ফরয শেষে কি সম্পূর্ণ সুন্নাত আদায় করতে হবে, নাকি সুন্নাতের যে কয় রাক'আত বাকী ছিল শুধু তাই আদায় করলে চলবে?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ জামা'আতে শামিল হওয়ার জন্য সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিলে জামা'আত শেষে সম্পূর্ণ সুন্নাত আদায় করতে হবে, শুধু ছুটে যাওয়া অংশ নয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২০ 'ওযূ ভঙ্গ হওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম দেওয়া হ'লে তাতে মৃতব্যক্তির কোন উপকার হয় কি? এরূপ কুরআন খতম বৈধ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মামূন
শ্যামপুর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। এটি নব আবিষ্কৃত একটি আমল মাত্র। অর্থাৎ বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগে এ ধরনের আমল ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম, হা/৪৪৬৮, পৃঃ ৭৭ 'মীমাংসা' অধ্যায়)*। কাজেই শরী'আত অননুমোদিত এ জাতীয় আমলে উপকার নয় বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ কোন্ সময় ও কি উদ্দেশ্যে ইস্তেখারার ছালাত পড়তে হয়? ইস্তেখারার ছালাত পড়ার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ রোজিনা খাতুন
হেতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইস্তেখারার দু'রাক'আত ছালাত দিন বা রাতে যে কোন সময়ে পড়া যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন কাজটি উত্তম ও কল্যাণকর হবে তা জানার উদ্দেশ্যে এ ছালাত আদায় করতে হয়। পৃথকভাবে দু'রাক'আত নফল ছালাতে অথবা ফরয ছালাতের জন্য নির্ধারিত সুন্নাত সমূহে কিংবা 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত ছালাতে ইস্তেখারার দো'আ পাঠ করা যায়। সূরা ফাতিহার পরে যেকোন সূরা পাঠ করে হাম্দ ও দরূদ পাঠের পর ইস্তেখারার দো'আটি পড়তে হয়। এরপর ছালাতের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করতে হয়। উল্লেখ্য যে, এই দো'আটি ক্বিরাআতের পরে রুকূর পূর্বে, সিজদাতে এবং শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বেও পড়া যায়। কেননা ছালাতের মধ্যে মুছল্লী তার প্রভুর সাথে নিরিবিলি কথা বলে *(আহমাদ, মিশকাত হা ৮৫৬; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩৬-১৩৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ মৃত পিতা-মাতার জন্য ছালাতের মধ্যে দো'আ করা যাবে কি? 'রাব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী ছাগীরা' দো'আটি শেষ বৈঠকে পড়া যাবে কি?

-আশীকুর রহমান
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তরঃ ছালাতে মৃত পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা যাবে এবং শেষ বৈঠকেও 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী ছগীরা' দো'আটি পাঠ করা যাবে। কেননা তাশাহহুদের বৈঠকে নির্দিষ্ট দো'আ পড়ার পর কুরআন-হাদীছ থেকে যেকোন দো'আ করা যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৯০৯ 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ)*। তবে রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো'আ সমূহ পাঠ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূ ও

সিজদাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ 'মালাকুল মউত' এসে মূসা (আঃ)-কে সালাম না দেয়ার কারণে তিনি তাঁকে থাপ্পড় মেরে চোখ কানা করে দিয়েছিলেন। এ কথা কি ঠিক?

-আব্দুল আযীয
কৈবর্ত্ত গ্রাম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মলাকুল মউত মূসা (আঃ)-কে সালাম না দেয়ার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে তিনি থাপ্পড় মেরেছিলেন এবং তাতে মালাকুল মউত-এর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এটি ছহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩)*। অবশ্য মুহাদ্দিছ ইবনু হিব্বান (রহঃ) ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুমতি ব্যতীত তার কাছে আসায় এবং মূসা (আঃ) তাকে চিনতে না পারায় থাপ্পড় মেরেছিলেন। এছাড়া তিনি তাকে যে আকৃতিতে চিনতেন তিনি সে আকৃতিতে আসেননি *(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ এশার ছালাত কাযা হ'লে কি 'বিতর' ছালাতও কাযা পড়তে হবে? জুম'আর ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাত কত রাক'আত?

-শাহ আলম
বেতীল বাজার, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এশার ছালাত কাযা হ'লে এশার ছালাতের ক্বাযা আদায়ের সময় বিতরও ক্বাযা আদায় করে নিবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ বিতর না পড়ে সকাল করবে, তখন সে যেন বিতর পড়ে নেয়', অর্থাৎ ক্বাযা আদায় করে নেয় *(বায়হাক্বী, হাকেম, সনদ ছহীহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭, 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*।

জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১)*। অন্যথা মুছল্লী কেবল 'তাহইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে। জুম'আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার অথবা দুই রাক'আত পড়া যায়। এছাড়া চার এবং দুই মোট ছয় রাক'আতও পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬; মির'আত ২/১৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ চাকরি করার সময় যদি শর্তারোপ করা হয় যে, দাড়ি রেখে চাকরি করা যাবে না, তাহ'লে উক্ত চাকরি করা যাবে কি?

-মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা যাবে না *(বুখারী, হা/৭১৪৫; মিশকাত হা/৩৬৬৫)*। কাজেই চাকরির ক্ষেত্রে দাড়ি না রাখার শর্তারোপ করলে উক্ত চাকরি করার প্রশ্নই আসে না। কারণ আল্লাহ হ'লেন একমাত্র রূযীদাতা। তিনি বলেন, 'যারা আল্লাহকে ভয় করে মহান আল্লাহ তাদের ব্যবস্থা করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন, যার সে ধারণাও করতে পারে না' *(তালাক্ব ২-৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সৎ কর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে পরস্পরে সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনের ১০৫৩ পৃষ্ঠায় নর-নারীর জন্য ছয় ধরনের খেলা বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেয়া, স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা, সাঁতার কাটা, সুতা কাটা ও দৌড় প্রতিযোগিতা। এ ছয়টি খেলা ছাড়া অন্য কোন খেলা শরী'আতে বৈধ কি?

-আব্দুল্লাহ ছিদ্দিক্বী
বাশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনে উল্লিখিত ছয়টি খেলার মধ্যে তিনটি খেলার বর্ণনাসূত্র দুর্বল হ'লেও নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত খেলা সহ আরও অন্যান্য খেলা জায়েয আছে। শর্তগুলি নিম্নরূপ-

(ক) আল্লাহ্‌র যিকির ও ছালাত থেকে বিরত না রাখা (খ) মূল্যবান সময়ের অপচয় না হওয়া (গ) খেলার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও দুশমনি সৃষ্টি না হওয়া (ঘ) টাকা-পয়সার হার-জিত না হওয়া অর্থাৎ জুয়া না হওয়া *(শায়খ বিন বায মাজমূ'আ ফাতাওয়া ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৩৯১ 'প্রতিযোগিতা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ মসজিদে তারাবীহর ছালাত চালু থাকা সত্ত্বেও জনৈক আলেম তার বাড়ীতে নিজ ছেলেমেয়ের ইমামতির মাধ্যমে পৃথকভাবে মহিলাদের তারাবীহর ছালাতের জামা'আত চালু রেখেছেন। উক্ত তারাবীহর ছালাত বাবদ তিনি সম্মানী হিসাবে রীতিমত ভাতাও গ্রহণ করেন। কেউ না দিলে বা কম দিলে সে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এ বিষয়ে শারঈ ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ মহিলারা পৃথকভাবে জামা'আত করে বাড়ীতে তারাবীহর ছালাত আদায় করতে পারে *(তাবরাণী আওসাত, ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৯০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৭৪ পৃঃ; সনদ হাসান, আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৮)*। তবে মসজিদে মহিলাদের জামা'আতের সুব্যবস্থা থাকলে সেখানে শরীক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইমাম হিসাবে সম্মানী ভাতা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু অশালীন আচরণের মাধ্যমে নয়। আল্লাহ বলেন,

'মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ সবজির ওশর বা যাকাত দিতে হবে কি? উল্লেখ্য যে, ২০, ৪০, ৬০, ৮০, ১০০ মন এই নিয়মে ধান বা অন্য শস্যের ওশর বের করতে হয়। কিন্তু ৮৫ বা ৯৫ মণ হ'লে শুধু কি ৮০ মনের ওশর বের করলেই চলবে, নাকি অতিরিক্ত ৫ মণেরও ওশর আদায় করতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফফানুল্লাহ
মাগুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শাক-সবজি বা কাঁচা মালের কোন ওশর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ 'কাঁচা মালে কোন যাকাত (ওশর) নেই' *(ছহীহ জামেউছ ছগীর হা/৫৪১১)*। তবে মালিক ইচ্ছা করলে দান করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত অবস্থায় দান করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে এবং নেছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৯৯ 'যাকাত' অধ্যায়)*। অন্যান্য শস্যের যাকাত ১৮ মণ ৩৭ কেজি (বাংলা প্রায় ২০ মণ) হ'লে ১ মণ দিতে হবে, ৩০ মণ হ'লে দেড় মণ অর্থাৎ ২০ মণের অধিক যত হবে হিসাব করে সব মালের ওশর বের করতে হবে। কাজেই ৮৫ বা ৯৫ মন হ'লে ৮০ মণের ওশর দিতে হবে বাকী মালের দিতে হবে না একথা ঠিক নয়। উল্লেখ্য যে, বিনা সেচে বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হ'লে উক্ত ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ ছালাত অবস্থায় অথবা ছালাত শেষে স্মরণ হ'ল যে, শরীর বা কাপড়ে অপবিত্র লেগে আছে কিংবা কোন অপবিত্র বস্তু পরিলক্ষিত হ'ল, এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-মিসেস রাশীদা বেগম
ড্রিম হাউজ, দক্ষিণগাঁও, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাত সিদ্ধ হওয়ার জন্য দেহ, কাপড় ও স্থান পাক হওয়া যরূরী *(মায়েদাহ ৬; মুদ্দাছছির ৪; মুসলিম, 'যাকাত' অধ্যায় হা/১০১৫; মিশকাত হা/৭৩৭, ৭৩৯)*। ছালাত অবস্থায় অপবিত্রতার কথা স্মরণ হ'লে পবিত্রতা অর্জন করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। আর ছালাত শেষে স্মরণ হ'লে পুনরায় ছালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই *(মুসলিম, শায়খ বিন বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১০/৩৯৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন ছাদাক্বা করলে মৃত ব্যক্তি নেকী পাবে কি?

-আব্দুস সাত্তার
মুহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবার তথা নিকটাত্মীয়রা ছাদাক্বা বা দান করলে মৃত ব্যক্তি উক্ত দানের নেকী পাবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু কোন অছিয়ত করে যাননি। আমার ধারণা তিনি কথা বলতে পারলে ছাদাক্বা করতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে তিনি নেকী পাবেন কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০ 'স্বামীর মাল থেকে স্ত্রীদের ছাদাক্বা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ কোন ব্যক্তি অসুস্থ থাকলে তার পরিবারের লোকজন তার কাযা ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-ইদরীস আলী
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ এ ধরনের কাযা আদায়ের কোন নির্দেশ শরী'আতে নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, কেউ কারো পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না *(মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৩০ 'ক্বাযা ছালাত' অনুচ্ছেদ, ফাৎহুল বারী, ১১/১১৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ বর্তমানে কিছু মেয়ে এমন এক ধরনের বোরক্বা পরিধান করে যাতে শরীরের অঙ্গগুলি অনুমান করা যায়। এ ধরনের বোরক্বা পরিধান করা কি জায়েয?

-জি,এম, জসীমুদ্দীন সরকার
নরিয়াবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এ ধরনের বোরকা পরিধান করা জায়েয নয়। পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য হ'ল দেহকে আবৃত করা ও পর্দা বজায় রাখা। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা আবশ্যক। তাই এমন অমার্জিত আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করা জায়েয নয়, যার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ সমূহ ভেসে ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় জনৈক মুয়াযযিন মাগরিবের আযানে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ' না বলে 'ছাল্লু ফী রিহালিকুম' বলেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরূপ নির্দেশ হাদীছে আছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ মুয়াযযিনের বক্তব্য সঠিক। বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাতে বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে মুয়াযযিনকে 'ছাল্লু ফী

রিহালিকুম' 'তোমরা বাড়ীতে ছালাত আদায় কর' বলার জন্য আদেশ দিতেন *(বুখারী ১/৯২ পৃঃ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনের ছালাতে আযানে 'হাইয়া আলাতাইন'-এর পরিবর্তে 'ছাল্লু ফী রিহালিকুম' বলার জন্য মুয়ায্যিনকে আদেশ দিতেন *(বুখারী ১/৯২)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ কোন মুসলিম মুমূর্ষু রোগীর জন্য অমুসলিমের রক্ত গ্রহণ করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল হক্ব
লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ রোগীর জীবন নিয়ে যদি সংশয় দেখা দেয় এবং রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা প্রবল হয় সেক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম যেকোন ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা যাবে *(নাহল ১১৫; আন'আম ১১৯)*। এ বিষয়ে সঊদী আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, কোন মানুষ যদি অসুস্থ হয় এবং রক্ত প্রদান ব্যতীত জীবন রক্ষার সম্ভাবনা না থাকে তাহ'লে রক্ত প্রদানে কোন ক্ষতি নেই, উভয়ের দ্বীন (ধর্ম) ভিন্ন হ'লেও *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াতুল কিবারিল ওলামা ২/৮৯৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ জুম'আর খুৎবায় জনৈক ইমাম বললেন, ফেরেশতারা যখন আদম (আঃ)-কে সিজদা করেন, তখন পরপর দু'টি সিজদা করেছিলেন। তাই আমরা ছালাতে দু'টি করে সিজদা করি। এই বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীক আহমাদ
ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ সূরা বাক্বারাহর ৩৪ নং আয়াতে ফেরেশতা কর্তৃক আদম (আঃ)-কে যে সিজদার কথা বলা হয়েছে তা ছিল মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করা। ছালাতের সিজদার ন্যায় সিজদা ছিল না। তবে বর্তমানে উক্ত মাথা নত করার পদ্ধতিতে কাউকে সম্মান করা জায়েয নয় *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৬৮০)*। উল্লেখ্য, ছালাতে আমরা যে দু'টি সিজদা করি তা সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে শিখিয়ে দেয়া।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ আমাদের এলাকায় কিছু লোককে কুঁচে খেতে দেখা যায়। এটি খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ কুঁচে জলজ প্রাণী। এটি হালাল প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। কারো রুচি হ'লে তা খেতে পারে। তবে কোন বস্তু হালাল হ'লেই খেতে হবে এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং রুচি না হ'লে খাবে না। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সান্ডার আকৃতি বিশিষ্ট 'যাব' রান্না করে পেশ করা হ'লে তিনি খেতে অনীহা প্রকাশ করেন। তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) বলেন, এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। এটি আমার এলাকায় নেই। তখন খালিদ (রাঃ) তা খেতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১১ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ হাজরে আসওয়াদে মুখ রেখে ক্রন্দন করা সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আলহাজ্জ সাব্বির আহমাদ
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১১১, ৪/৩০৮ পৃঃ)*। ইমাম নাসাঈ বলেন, হাদীছটি পরিত্যক্ত। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি 'মুনকার' বা অগ্রহণযোগ্য *(ইরওয়া, ঐ)*। বরং স্পর্শ করত চুম্বন করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫৬৭)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ মৃত বাঘ ক্রয় করা যাবে কি?

-এনামুল হক্ব
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মৃত প্রাণী হারাম করেছেন *(মায়েদাহ ৩)*। তবে মাছ এবং টিড্ডি (পঙ্গপাল) মরা হ'লেও তা খাওয়া বা ক্রয়-বিক্রয় হালাল *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৩২ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*। অপরদিকে মৃত পশুর চামড়া দ্বারা উপকার লাভ করাও জায়েয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৯)*। তবে হারাম পশুর মধ্যে কুকুর ও শুকর ব্যতীত অন্যান্য পশুর চামড়া, হাড়-শিং, পশম, নখ ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করা শরী'আতে জায়েয আছে *(নায়লুল আওত্বার ১/৬১ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২০ পৃঃ, 'মৃতের হাড়, শিং, নখ, পশম, পালক ও চামড়া পাক' অনুচ্ছেদ)*। অতএব বাঘের চামড়া ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ কাযী অফিসে গিয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হ'তে চাইলে আমার পিতা রাযী হননি। তখন আমার চাচাকে নিয়ে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এ বিবাহ কি জায়েয হয়েছে।

-খাদীজা
শাহারবাটি, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়ার পর তিন মাসের মধ্যে স্ত্রী ফেরত নিলে বিবাহ পড়াতে হবে না। তবে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ফেরত নিতে চাইলে বিবাহ পড়াতে হবে *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তখন মেয়ের পিতার উপস্থিতি একান্ত যরূরী। পিতা জীবিত না থাকলে চাচা বিবাহ পড়াতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। তবে পিতার জীবদ্দশায় চাচার অভিভাকত্বে বিবাহ জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনী, নবী নাম জপে যেজন, সেই তো দো'জাহানের ধনী, নবী মোর নূরে খোদা, তার তরে সকল পয়দা, আদমের কূলবেতে তারই নূরের রৌশনী... । এই কবিতা পড়া যাবে কি?

-আবুল হোসাইন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কবিতা শিরক মিশ্রিত। এ ধরনের কবিতা রচনা ও পাঠ করলে শিরক হবে। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। উক্ত বিশ্বাস কারো মধ্যে থাকলে সে মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। তাছাড়া নবী-রাসূল মানুষ হিসাবে তাদের নাম জপা যায় না। তাঁরা মানুষের অনুসরণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর নাম জপতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র। আল্লাহ কুরআনে বহু জায়গায় তার যিকির করার কথা বলেছেন। অত্র কবিতায় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নূর বলা হয়েছে অথচ তিনি হচ্ছেন মাটির তৈরী মানুষ। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র' *(কাহাফ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ ইসলামের বিধান মতে যৌতুক নেওয়া হারাম। কিন্তু একজন নিতান্তই বেকার ও দরিদ্র, যার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার পক্ষে স্ত্রীর মোহর ও সাজসজ্জার অর্থ যোগানো অসম্ভব। এরূপ ব্যক্তির যৌতুক না নিয়ে করণীয় কি?

-রুমেল ও ইলিয়াস
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যৌতুকের সাথে বিবাহের কোন সম্পর্ক নেই। এটা বিধর্মীয় হিন্দুয়ানী প্রথা। সামর্থ্যহীন ব্যক্তির সামান্যতম মোহর দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তাকে ছিয়াম পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে এবং চক্ষুকে আনত রাখে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। তবে দারিদ্র্যতার অজুহাতে কোন অবস্থাতেই যৌতুক গ্রহণ জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে ফিৎরা আদায় করতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ যার' ছিয়াম পালন করে না তাদেরকেও ফিৎরা আদায় করতে হবে। কারণ ফিৎরা আদায়ের জন্য ছিয়াম পালন করা বা না করাকে শর্ত করা হয়নি। বরং মুসলিম হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকল মুসলিমের উপর এক ছা' করে খাদ্যশস্য যাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন এবং ঈদের ময়দানে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ খতম তারাবীহ কি জায়েয? খতম তারাবীহ্তে কষ্ট হয় বিধায় অনেক মুছল্লী এশার জামা'আতে আসেন না। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-আব্দুল মালেক
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ খতম তারাবীহ বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই। রামাযানে রাত্রিকালীন ইবাদত হিসাবে এবং মুছল্লীদের আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তারাবীহ্র ছালাত দীর্ঘায়িত করেছিলেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৯৮ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। ছাহাবায়ে কেরামের অনেক ইমামই ৮ রাক'আত (ت) তারাবীহ্তে সূরায়ে বাক্বারাহ তথা আড়াই পারা কুরআন খতম করতেন *(মুওয়াত্ত্বা, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০৩ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটি কোন বাঁধাধরা নিয়ম নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামতি করলে সে যেন ছালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ জামা'আতে অনেক অসুস্থ, দুর্বল এবং বৃদ্ধ মানুষ থাকেন। তবে কোন ব্যক্তি একা ছালাত আদায় করলে ইচ্ছামত ছালাত দীর্ঘায়িত করতে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩১ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা খাটো হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূই প্রধান বিষয়। খতম তারাবীহ্র ভয়ে এশার জামা'আতে না আসা নিতান্তই অন্যায়। কারণ 'ফজর ও এশার ছালাতে হাযির হওয়াই মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৯ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। দীর্ঘ ক্বিরাআতের ফলে অধিক সময় দাঁড়িয়ে থেকে নফল ছালাত আদায় করা কারো জন্য কষ্টকর হ'লে তিনি এশার জামা'আতে হাযির হয়ে পরে একাকী বাড়ীতে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ কুনূতে রাতিবা কখন পড়তে হবে? রুকূর আগে না পরে? এতে হাত উঠাতে হবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ
সত্যজিতপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ কুনূতে রাতিবা বা বিতরের কুনূত রুকূর পূর্বে অথবা পরে দু'সময়েই পড়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯)*। বিতরের কুনূতে হাত তোলা সম্পর্কে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ছাহাবীগণ থেকে কিছু আছার পাওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বোরাকে উঠার সময় আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)

আল্লাহর ইচ্ছায় পাথর হয়ে জান এবং তার উপর পা রেখে তিনি বোরাকে উঠেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করে বলেন, আল্লাহ যেন তাকে সকল পীরের সরদার করেন। একথা কি সত্য?

-আমানুল্লাহ
কোর্টবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আব্দুল কাদের জিলানী ৫০০ হিজরীর মানুষ আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ ঘটেছে হিজরী বছর গণনা শুরু হওয়ার পূর্বে। জন্মের পাঁচ শতাধিক বছর পূর্বে কিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটতে পারে? অতএব এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে ফিরে আসা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কখন এবং কোথায় আসবেন? তাঁর কবর কোথায় হবে?

-আনীসুর রহমান, ঢাকা।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) পৃথিবী ধ্বংসের শেষ মুহূর্তে দেমাশক-এর পূর্ব দিকে দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৪)*। তাঁর কবর কোথায় হবে এ সম্পর্কে ছহীহ সূত্রে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের পার্শ্বে তার কবর হবে বলে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তার সূত্রএটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৫০৮; যঈফ তিরমিযী হা/৭৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে ওযু-গোসলের পানি বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য গলার ভিতরে চলে গেলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-ইসহাক্ব
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত কোন কিছু গলার ভিতরে চলে গেলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩)*। কারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে কোন বিধান তার উপর চাঁপিয়ে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ কোন মানুষের উপর তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাঁপিয়ে দেন না *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যা তোমাদের ভুলবশতঃ ঘটে সে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না *(আহযাব ৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬)ঃ সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে দরিদ্রতা আসে, একথা সত্য কি?

-মাষ্টার আনীসুর রহমান
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেনা বিস্তার লাভ করে তখন তাদের মাঝে মহামারি এবং দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে *(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯, হাদীছ ছহীহ 'ফিতনা' অধ্যায়, 'শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭)ঃ কুরবানীর জন্য পূর্বে ক্রয় করে রাখা পশু সংসারের অভাবের কারণে বিক্রি করা যাবে কি? এবং পরবর্তীতে উক্ত মূল্যে বা অতিরিক্ত মূল্যে পশু ক্রয় করে কুরবানী করলে বৈধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খায়রুল ইসলাম
নলত্রী পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ পূর্বে ক্রয় করে রাখা কুরবানীর পশু পরিবারের নিতান্ত অভাবের কারণে বিক্রি করে খরচ করতে পারবে। কেননা পরিবারের খরচ বহন করা তার জন্য আবশ্যক *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১১৪১, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১১৩৮)*। অতঃপর পরবর্তীতে সামর্থ্য হ'লে পুনরায় পশু কিনে কুরবানী করবে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮)ঃ খাৎনা দেয়ার সময় মুখে ক্ষীর দেয়া এবং গোসল দেয়ার সময় চারপাশে পান রাখা কি জায়েয?

-আমীন
সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ খাৎনা করার সময় গোসল দেয়া ও মুখে ক্ষীর দেয়ার কোন বিধান নেই। বরং এগুলি কুসংস্কার, যা পরিহার করা অপরিহার্য। খাৎনা ইসলামী বিধান, যা পালন করা আবশ্যক। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইসলামী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঁচটি তার একটি হচ্ছে খাৎনা করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯)ঃ ভুল করে ছালাতের প্রথম রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে রুকুতে চলে গেলে এবং তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষের এক বা দু'রাক'আতেই সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পড়লে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এভাবে ছালাত হয়ে যাবে। কারণ ছালাত জায়েয হওয়ার জন্য সূরা ফাতিহা আবশ্যক। কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হয় না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২)*। আর শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৯)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০)ঃ নমরূদ ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন ফুলবাগানে পরিণত হয়ে যায়। এ হাদীছ সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-এবাদুল্লাহ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হ'লে আগুন ফুলবাগানে পরিণত হয়েছিল একথা সঠিক নয়, বরং আগুন ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়েছিল। আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'হে আগুন তুমি ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ৬৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন টিকটিকি ব্যতীত সকল প্রাণী আগুন নিভানোর চেষ্টা করেছিল। আর টিকটিকি আগুনে ফুঁক দিয়ে আগুন শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিল। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি হত্যা করতে বলেছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৩১; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬৩৪)*।

সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং ডঃ গালিবের মুক্তির দাবীতে

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর

আহলেহাদীছ জাতীয়

মহাসম্মেলন

সভাপতিত্ব করবেনঃ

শায়েখ আব্দুছ ছামাদ সালাফী

ভারপ্রাপ্ত আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্থানঃ
মুক্তাঙ্গন
ঢাকা।

১

সেপ্টেম্বর '০৬
শুক্রবার
দুপুর ২ টা

বক্তব্য রাখবেনঃ
'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ
ও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ